তন্ত্রকথা

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১০৩

প্রকাশ ১৩৬২ বৈশাখ

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা

৩.১

সূচীপত্র

ভূমিকা

ব্যাপক অর্থে তন্ত্র শব্দ শাস্ত্রমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। তাই সাংখ্যদর্শনের অপর নাম কাপিলতন্ত্র বা ষষ্টিতন্ত্র; ন্যায়দর্শনের নাম গোতমতন্ত্র; বেদান্তদর্শনের নাম উত্তরতন্ত্র; মীমাংসাদর্শনের নাম পূর্বতন্ত্র। শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদকে বৈনাশিকতন্ত্র নামে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের উপাধি ছিল 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র'। তন্ত্র শব্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভাগবিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয় (বৃহৎসংহিতা ১।৯)।

তবে উপাসনাবিশেষপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ অর্থেই তন্ত্র শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং এই অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য এই অর্থে আগম শব্দও প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং 'তন্ত্র' আগমের একটি বিশেষ বিভাগরূপে গৃহীত হয়। তবে প্রাচীনকাল হইতেই তন্ত্র ও আগমের একই অর্থে প্রয়োগও দুর্লভ নহে। তন্ত্রসার, তন্ত্রসমুচ্চয়, তন্ত্রালোক, আগমতত্ত্ববিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের নামই তাহার নিদর্শন।

বারাহীতন্ত্রে আগম, তন্ত্র, যামল, ডামর প্রভৃতির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে ইহাদের আলোচ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে[১]। কিন্তু সেই বিষয় নির্দেশ হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উহাতে অনেক স্থলে পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উপলভ্যমান তন্ত্রগুলিও অনেক স্থলেই বারাহীতন্ত্র-নির্দিষ্ট লক্ষণের অনুগত নহে।

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় (১০ অ) পাঞ্চরাত্র তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলিকে দশ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মতঙ্গপরমেশ্বরীতন্ত্র বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্যা

---

১ সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ ॥
ষট্‌কর্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্‌বিদুর্বুধাঃ ॥

নামে চারি পাদে বিভক্ত হইয়াছে। টীকাকার রামকণ্ঠ যোগ ও চর্যা স্থলে উপাস্যা ও সিদ্ধি এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিভাগ তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুইটি: (১) দর্শন (২) ক্রিয়া। মূলতঃ আলোচ্য বিষয়ের এইরূপ বিভাগ-ভেদ অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ তন্ত্রগ্রন্থের দুইটি শ্রেণী নির্দেশ করেন: (১) যোগতন্ত্র (২) ক্রিয়াতন্ত্র।

তন্ত্রোক্ত উপাসনা আলোচনা করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যথা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র পূজায় মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন— এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার, কার্যে সিদ্ধি লাভের জন্য মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি ষট্‌কর্মের আশ্রয়গ্রহণ এবং যোগানুষ্ঠান। অবশ্য কালক্রমে তন্ত্রোপাসনাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য দশ সংস্কার শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের তান্ত্রিক ভেদও কল্পিত হইয়াছিল

বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও বিরলপ্রচার হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রতপূজা আজকাল অনেক স্থলে পূর্ণ বা আংশিক ভাবে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে বৈদিক উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ন্যায় তান্ত্রিক দীক্ষা ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে কোনোরূপ তান্ত্রিক উপাসনায় অধিকার জন্মে না। কেবল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেই যে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী তাহা নহে, আচণ্ডাল পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে—তথাকথিত নীচবর্ণের মধ্যেও কেহ কেহ এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাদির ন্যায় নিত্য সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। তবে কে কোন্ দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত কে কোন্ দেবতার উপাসক তাহা প্রকাশ করিবার নিয়ম তন্ত্রশাস্ত্রে নাই। সম্প্রদায়ের লোক ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর সকলের নিকটই ইহা অজ্ঞাত।

তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য

তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচীনত্ব ও ব্যাপকত্ব

তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বর্তমানে যেসকল তন্ত্রগ্রন্থ আমরা পাই, তাহা যে সময়ের লেখাই হউক-না কেন, এই অনুষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নানা দেশের লোকের মধ্যে নানা ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত যে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে নাই—তবে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আচার যে তান্ত্রিকতার অতি প্রাচীনতা সূচিত করে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রের ষট্‌কর্মের ও কৌলাচারের অনুরূপ ক্রিয়া, উপাসনায় মদ্যাদির ব্যবহার, মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস— বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাক্তন ধর্মের এইগুলিই ছিল প্রধান অঙ্গ।

অপরকে বশীভূত করিবার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রাচীনকালে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনাকারিগণ এইরূপ ক্রিয়াকে sympathetic বা imitative magic নামে অভিহিত করিয়াছেন। মোম অথবা তজ্জাতীয় কোনো দ্রব্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া, ঐ প্রতিকৃতিকে অভিমন্ত্রিত করা এবং শত্রুর অঙ্গাদি অথবা প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য নখাদির দ্বারা ঐ প্রতিকৃতি আহত করা অথবা অগ্নিতে দ্রবীভূত করার প্রথা সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইরানীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ আচার বর্তমান ছিল।

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কার্যাবলীর উদাহরণও বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস্ ও রোমে 'পান' পূজায় এইরূপ কার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রশান্তমহাসাগরের কোনো কোনো দ্বীপে আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে স্ত্রী-সঙ্গাদি কার্য ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। এই ইন্দ্রিয়-

পরতন্ত্রতা বা লিঙ্গপূজার চিহ্ন পরবর্তী যুগে নানা বেশে নানা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়াল্ সাহেবের মতে সমস্ত ধর্মে গৌণ অথবা মুখ্য ভাবে লিঙ্গপূজার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নায়ক-নায়িকার প্রেম ও রতিসুখ-ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে ভগবদুপাসনার রূপকরূপে কল্পনা করার বিবরণ সুফী, বৈষ্ণব এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া ভগবদুপাসনার প্রথা তন্ত্রের মত খ্রীস্টান সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না। ধর্মোৎকর্ষ লাভের জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও নানাদেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাওয়া যায়।

সমস্ত দেশেই অভিচার-কার্যে আপাততঃ নিরর্থক শব্দ-সমষ্টির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, যে শব্দটি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য তাহাই অধিক ফলোপধায়ক বলিয়া মনে করা হয়।

ভারতে তান্ত্রিকতা

তান্ত্রিক আচার ভারতে কতদিন হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীন কালেই ভারত এবং তৎসমীপবর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, তাহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্যগণ উহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন।

কোনো কোনো তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রথম নিদর্শন প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভারতে পাওয়া যায়। ব্রুস্ ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যসমূহের মধ্যে কয়েকটি লিঙ্গ-মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্যামশাস্ত্রীর মতে খ্রীস্টের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বেই ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর কতগুলি ভারতীয় মুদ্রার উপর যেসমস্ত দুর্বোধ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মতে তাহা তান্ত্রিক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিকতার পূর্ব রূপ নিঃসন্দিগ্ধরূপেই পাওয়া যায়। তান্ত্রিকদিগের মতে সমস্ত তন্ত্রানুষ্ঠানই বৈদিক— বেদ হইতেই

তন্ত্রের উৎপত্তি। এমনকি, বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই তান্ত্রিক বীজমন্ত্রাদি অনুস্যূত রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সাধারণ ধারণা এই যে, তন্ত্রমত অথর্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে। কোনো কোনো তন্ত্রগ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নেপাল দরবার লাইব্রেরির কালীকুলার্ণবতন্ত্রের পুথির প্রথমেই আছে: 'অথাত আথর্বণসংহিতায়াং দেব্যুবাচ'। রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে মহাদেবীকে অথর্ববেদশাখিনী বলা হইয়াছে। দামোদর-কৃত যন্ত্রচিন্তামণি-গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-প্রশংসা-প্রসঙ্গে উহাকে অথর্ববেদসারভূত বলা হইয়াছে। কুলার্ণবতন্ত্রে (২।১০) কৌলাচারেরও বৈদিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে (২।৮৫) কুলশাস্ত্রকে 'বেদাত্মক' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং কুলাচারের মূলীভূত কয়েকটি শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে (২।১৪০-১৪১)। সৌন্দর্যলহরীর ৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লক্ষ্মীধর শ্রীবিদ্যার বৈদিকত্ব প্রতিপাদনের জন্য তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক হইতে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামশাস্ত্রী দেখাইয়াছেন—তান্ত্রিক যন্ত্র ও চক্রের বর্ণনা অথর্ববেদ তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে (৪।২৭) তান্ত্রিকমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। সায়ণাচার্যের মতে ঐ মন্ত্র অভিচার-কর্মে প্রযুক্ত হয়।

ধর্মার্থ ইন্দ্রিয়োপভোগের নিদর্শনও বেদের নানা অংশে পরিলক্ষিত হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রী-সঙ্গাদির একটা আধ্যাত্মিক ভাব দেখাইবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বামদেব্য উপাসনার স্পষ্ট নির্দেশ —স্ত্রীলোককে পরিহার করিবে না।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও বেদের মধ্যে একাধিক স্থলে দেখা যায়। সৌত্রামণিযজ্ঞে ইন্দ্র, সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়কে সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। বাজপেয় যজ্ঞেরও বিধি এইরূপ। যজ্ঞকার্যে বহুল ব্যবহৃত সোমরসের মাদকতা-গুণের সবিশেষ বর্ণনাও বৈদিক সাহিত্যে আছে।

তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পশুবলির ন্যায় বৈদিক যজ্ঞে পশু নিহত করিবার প্রথা ছিল। এই উপলক্ষ্যে অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ বলি দিবার বিধি ছিল।

তান্ত্রিক ষট্‌কর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক যুগেই পাওয়া যায়। অথর্ববেদের অধিকাংশই তো এইরূপ কার্যের বিবরণে পরিপূর্ণ। ঋগ্বেদের দশ মণ্ডলে (১৪৫, ১৫৯ সূক্তে) সপত্নী-বিনাশ ও পতিবশীকরণের কথা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (২।৩।৯।১) সাংগ্রহণী নামে এক ইষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সাংগ্রহণী ইষ্টি ও তান্ত্রিক বশীকরণের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ হইতে (২।৩।১০) জানিতে পারা যায়, প্রজাপতিদুহিতা সীতা সোমকে বশীভূত করিবার জন্য আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাদুর্ভাবকালেও তান্ত্রিক আচার প্রচলিত ছিল। তন্ত্র শব্দ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত না হইলেও তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচারের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। তেবিজ্জসুত্ত হইতে জানিতে পারা যায়— একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শরীররক্ষা ও অনিষ্ট-পরিহারের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। কেহ কেহ পরের নানাবিধ উন্নতি বা অবনতি সাধনের জন্য মন্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। ব্রহ্মজালসুত্তেও তন্ত্রাচার-সদৃশ একাধিক আচারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্রগ্রন্থের প্রাচীনতা

তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও উপলভ্যমান তন্ত্রগ্রন্থগুলিকে অত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তান্ত্রিক উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগে রচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তাহাদের ভাব ও ভাষা বৈদিক যুগের বলিয়া প্রতীত হয় না। বস্তুতঃ দেবতাকথিত বলিয়া উল্লিখিত মূলতন্ত্রগুলিও যে সমস্তই প্রাচীন এমন কথা বলা চলে না। অনেক গ্রন্থের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। আশঙ্কা হয়, 'বৃহৎ' এই বিশেষণে বিশেষিত গ্রন্থগুলি অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থগুলির নবীন রূপ—কোনো নূতন গ্রন্থকে প্রাচীনতার মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টাই 'বৃহৎ' বিশেষণ সংযোগের হেতু হওয়া বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ বৃহদ্রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে এই আশঙ্কাই দৃঢ় হয়। বৃহদ্রুদ্রযামলের কোনো উল্লেখ কোনো প্রাচীন নিবন্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রাচীন তালিকা

আছে তাহার কোনোটির মধ্যেও এই গ্রন্থের নাম আছে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গাক্ষরে লিখিত ইহার তিনখানি পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় আছে। এই গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যের ধরনে পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রীসমাজে প্রসিদ্ধ পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঁচুঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদের ইষ্টসাধন করেন এবং অসন্তুষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকেন। লৌকিক দেবতার বিবরণ সংস্কৃতগ্রন্থে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না— সেই দিক্ দিয়া গ্রন্থখানির কিছু মূল্য আছে। পঞ্চাননের পূজা তন্ত্রবিহিত ইহা প্রতিপাদন এবং তদ্দ্বারা ইহার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে অর্বাচীন কালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিতে পারে।

'রাধাতন্ত্র' নামক গ্রন্থখানিকেও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলাদেশেই বোধ হয় ইহার উৎপত্তি। অন্ততঃ বাংলাদেশেই ইহার প্রচলন। ইহার যে কয়টি সংস্করণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সকলগুলিই বাংলাদেশ হইতে। ইহার হস্তলিখিত পুথি অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে লিখিত ও বাংলাদেশে প্রাপ্ত। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে কোনো কোনো নিবন্ধগ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতে ইহার সময়ের একটা সীমা নির্ধারণ করা যায়। রাজকিশোর-কৃত শক্তিরত্নাকর গ্রন্থে একাধিকবার রাধাতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে এই গ্রন্থের তারিখ জানা নাই। ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বিরচিত শ্যামাসপর্যাবিধি গ্রন্থের উপক্রমে গ্রন্থরচনার জন্য আলোচিত গ্রন্থসমূহের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে রাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই মাত্র স্থির করা যায় যে, রাধাতন্ত্র ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, এই দুই গ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতেও ইহাও বুঝা যায় যে, রাধাতন্ত্র গ্রন্থখানি একেবারে অপ্রামাণিক বা তান্ত্রিকসমাজে অপ্রচলিত নহে। বৃহদ্রাধাতন্ত্র নামে যে একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও রাধাতন্ত্রের অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় বলিয়া মনে হয়। রাধাতন্ত্র নামক

গ্রন্থের প্রসিদ্ধির জন্যই এই নামের সহিত বৃহৎ শব্দ যোগ করিয়া অন্য গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়া থাকিতে পারে। রাধাতন্ত্রে শক্তির উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণের জীবন চিত্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শাক্ত উপাসনার জীবন্ত চিত্র। রাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়—ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণ অনুষ্ঠিত উপাসনার ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ফলে, আপাততঃ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া মনে হইলেও এই গ্রন্থখানি মূলতঃ শাক্তধর্মের রহস্য ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত।

কয়েকখানি মূল তন্ত্রগ্রন্থে বা তাহাদের অংশ বিশেষে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দেখা যায়। মূলগ্রন্থগুলি প্রাচীন হইলেও এই অংশগুলির অর্বাচীনতা সন্দেহাতীত। কুলার্ণবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত ঈশান-সংহিতায় নানা যুক্তিসহকারে চৈতন্যদেবের দেবত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশ্বসার বা বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রের অংশরূপে নির্দিষ্ট গূঢ়াবতার নামক খণ্ডে ৪৫৮৬ কল্যব্দে চৈতন্যরূপে বিষ্ণুর অবতরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঊর্ধ্বাম্নায়-সংহিতায় বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধের স্থলে চৈতন্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মযামল ও কৃষ্ণযামলের চৈতন্যকল্প নামক অংশের কথাও এখানে বলা যাইতে পারে।

কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থে আবার অত্যাধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায় যোগিনীতন্ত্রে (১৩।১৪) কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুসিংহ বা বেণুসিংহের বিবরণ আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দপাদের জন্মবৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ হইয়াছে[২]। মেরুতন্ত্রে ইংরেজজাতি ও লণ্ডনের উল্লেখ আছে[৩]। কোনো কোনো তন্ত্রে (বিশেষতঃ শাবর-তন্ত্রে) বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহার দ্বারাও ঐসকল গ্রন্থের আধুনিকত্বই সূচিত হয়।

স্পষ্টতঃ আধুনিক এইসকল গ্রন্থকে অপৌরুষেয় বা শিবাদি দেব-প্রণীত বলিয়া চালাইতে গেলে স্বভাবতই সকলের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে। প্রাচীন কালেও যে এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে জাগে নাই, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ

২ মহানির্বাণতন্ত্র (ইংরেজি অনুবাদ), মন্মথনাথ দত্ত, ভূমিকা, পৃ. xi

৩ ইংরেজী নবষট্‌পঞ্চ লণ্ড্রাজ্ঞাপি ভাবিনঃ।

বৈষ্ণব লেখক যামুনাচার্য[৪] স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদল ভণ্ড বর্তমান কালেও আগমের নামে আগম-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রচার করে।

তাহা ছাড়া এক সম্প্রদায় আর-এক সম্প্রদায়ের দোষোদ্ঘাটনের সময় উহার কৃত্রিমতা ও অর্বাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যগ্রন্থে বেদোত্তম সোজাসুজি বলিয়াছেন—

> কেনচিদর্বাকৃতনেন ক্ষেত্রজ্ঞেন মহেশ্বরসমাননাম্না ত্রয়ীমার্গবহিষ্কৃতেয়ং প্রক্রিয়া বিরচিতা। তন্নাম-সামান্যেন কেচিদ্ ভ্রান্তা মহেশ্বরোপদিষ্টমার্গমবলম্বিতবন্তঃ

অর্থাৎ মহেশ্বর নামে অর্বাচীন এক ব্যক্তি বেদ-বিরুদ্ধ তন্ত্রমার্গ প্রচার করে। নামসাদৃশ্যনিবন্ধন কেহ কেহ ভ্রমে উহাকেই মহাদেব-প্রণীত মনে করিয়া ঐ মার্গ অবলম্বন করিয়াছে।

আবার যামুনাচার্য তাঁহার তন্ত্র-প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঞ্চরাত্রবিরোধীদিগের মত উপস্থাপন করিবার সময় বলিয়াছেন—

> বাসুদেবাভিধানেন কেনচিদ্ বিপ্রলিপ্সুনা।
> প্রণীতং প্রস্তুতং তন্ত্রমিতি নিশ্চিনুমো বয়ম্॥

অর্থাৎ বাসুদেব নামে এক প্রবঞ্চক ব্যক্তি এই তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে ইহাই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত।

পাঞ্চরাত্রমত-নিরাস-প্রসঙ্গে কোনো কোনো পুরাণেও এইরূপ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কূর্মপুরাণের মতে সাত্বতবংশীয় অংশু নামক ব্যক্তি কুণ্ডগোলাদি জাতির জন্য এক শাস্ত্র প্রবর্তিত করেন। তাঁহার নামানুসারে এই শাস্ত্র সাত্বতশাস্ত্র নামে পরিচিত।

বস্তুতঃ, ছলনার জন্য হউক আর নাই হউক, কোনো কোনো তন্ত্রগ্রন্থ যে অনতিপ্রাচীন কালে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যেও স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। দেবতার নিকট হইতে ব্যক্তিবিশেষের

---

৪ অদ্যত্বেঽপি হি দৃশ্যন্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাৎ।
অনাগমিকমেবার্থং ব্যাচক্ষাণা বিচক্ষণাঃ।—আগমপ্রামাণ্য, পৃ. ৪।

দ্বারা কোনো কোনো গ্রন্থ ভূতলে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে— আবার কোনো কোনো গ্রন্থ ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নেপাল দরবার লাইব্রেরির শ্রীমতোত্তর-তন্ত্র শিব কর্তৃক পার্বতীর নিকট প্রকাশিত হইলেও উহা শ্রীকণ্ঠনাথাবতারিত; মহাকৌলজ্ঞান-বিনির্ণয় মৎস্যেন্দ্রনাথাবতারিত; ব্রহ্মযামলান্তর্গত যোগবিজয়স্তবরাজ স্বর্গ হইতে পিপ্পলাদ মুনি কর্তৃক আনীত। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর শৈবদিগের মূলগ্রন্থ শিবসূত্র মহাদেব কর্তৃক বসুগুপ্তের নিকট স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছিল। নেপাল লাইব্রেরির পূর্বাম্নায়তন্ত্র রত্নদেব কর্তৃক রচিত হইয়াছিল— গ্রন্থপুষ্পিকায় স্পষ্ট এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ লাইব্রেরীর জ্ঞানলক্ষ্মী বা জয়াখ্যসংহিতা চন্দ্রদত্তের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ আধুনিক— এমনকি, অত্যাধুনিক হইলেও সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে অথবা তন্ত্রগ্রন্থমাত্রকেই আধুনিক বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি যে প্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। একাধিক পুরাণে যে তন্ত্র-নিন্দা বা তন্ত্রোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্রকে অন্ততঃ সেই সেই পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তন্ত্রবিরোধী সম্প্রদায় মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের কোনো কোনো বচনকে তন্ত্রনিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতসম্প্রদায়ের উল্লেখ একাধিক ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থে, মহাভারতে ও পুরাণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কয়েকখানি গ্রন্থের গুপ্তযুগে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। কুব্জিকাতন্ত্র নামক এইরূপ একখানি গ্রন্থের পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে নেপালের দরবার লাইব্রেরির নিশ্বাসতন্ত্রের পুথি ও সর্বজ্ঞানোত্তর তন্ত্রের খণ্ডিত পুথিও গুপ্তাক্ষরে লেখা। সর্বজ্ঞানোত্তর তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, এই তন্ত্র যখন লিখিত হইয়াছিল তখন অন্যান্য তন্ত্রের রচনা সমাপ্ত হইয়াছে। খ্রীস্টীয় দশম একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা তন্ত্রগ্রন্থের পুথিও নেপাল দরবার লাইব্রেরিতে আছে। প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থেও কোনো কোনো তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় পল্লবরাজ রাজসিংহ বর্মার কৈলাসনাথ মন্দির লিপিতে দাক্ষিণাত্যের অষ্টাবিংশতি

াবাগমের উল্লেখ আছে। নবম দশম শতাব্দীর তামিল শৈব কবিগণের লেখায় ঐ সময়কার কাশ্মীরের শৈব সাহিত্যে এই আগম-সাহিত্যের উল্লেখ াছে।

বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের পূর্বরূপ স্বরূপ বৌদ্ধ ধারণীগুলি খুব প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ ই। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু ধারণী সংবলিত সুরঙ্গমসূত্র াঠ করিতেন। বীল সাহেবের মতে এই গ্রন্থ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী ইতে পারে না, যেহেতু পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকের নিকট ইহা াতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। হিউএনচাঙের তে মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় তাব্দীতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তারনাথের মতে বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গকর্তৃক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্র বর্তিত হয়। তিনি তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন— সরহ 'বুদ্ধকপালতন্ত্র', ইপা 'যোগিনীসঞ্চর্যা', কম্বল ও পদ্মবজ্র 'হেবজ্রতন্ত্র', কৃষ্ণাচার্য 'সম্পুটতিলক', লিতবজ্র 'কৃষ্ণযমারিতন্ত্র', গম্ভীরবজ্র 'মহামায়া' এবং পীতো নামক এক ব্যক্তি ালচক্র-তন্ত্র' প্রবর্তন করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর হস্তলিখিত জাপানের হরিউজি বিহারে ক্ষিত পুথিগুলির মধ্যে পাঁচখানি তন্ত্রগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শ্রমণ মোঘবজ্র ৭৪৬ - ৭৭১ খ্রীস্টাব্দে চীন দেশে ছিলেন। তিনি চীনা ভাষায় ৭৭ ানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে উষ্ণীষচক্রবর্তিতন্ত্র, গরুড়গর্ভগতন্ত্র, জ্রকুমারতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতীশ াপঙ্কর চতুর্বিধ তন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় বম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তন্ত্রোপাসনা এবং কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ কাম্বোজে াবর্তিত হয়। এইসকল গ্রন্থ ভারতে যে ঐ সময়ের অনেক পূর্বে বর্তমান ্ল, তাহা স্পষ্টতই অনুমিত হয়।

উপরিনির্দিষ্ট বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে তকগুলি খুবই প্রাচীন। কালক্রমে পুরাণাদির মত কাহারও অনেক স্থান যে

সংস্কৃত ও পরিবর্তিত না হইয়াছে, এমন নহে। তবে কতকগুলি তন্ত্র (অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত।

তন্ত্র-প্রামাণ্য

তন্ত্রগ্রন্থ বা তান্ত্রিক আচার যত প্রাচীনই হউক-না কেন, ইহার প্রামাণিক' সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তান্ত্রিক আচার্যগণ ইহার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য ইহার বৈদিকত্ব ও অপৌরুষেয় প্রতিপাদন করিতে প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রের প্রামাণিক' আলোচনার জন্যই একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যামুনাচার্য-কৃ 'তন্ত্রপ্রামাণ্য', বেদোত্তম-কৃত 'পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য', বেদান্তদেশিকাচার্য-কৃ 'পাঞ্চরাত্র-রক্ষা' ও ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত 'তন্ত্রাধিকারিনির্ণয়' বিশেষ উল্লেখযোগ ইহা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভাস্কররায়, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি এই বিষে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া অপর সম্প্রদায়গুলিকে অপ্রম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে শাক্তের নিন্দা ও শাক্তগ্র পাঞ্চরাত্র-নিন্দা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায়ের গ্রে মধ্যেও আবার তদন্তর্গত উপ-সম্প্রদায় ও শাখার নিন্দাও প্রচুর পরিমাণে কর হইয়াছে। কৌলমার্গাবলম্বিগণ সময়মার্গের, সময়মার্গাবলম্বিগণ কৌলমার্গে পশ্বাচারিগণ কুলাচারিগণের, কুলাচারিগণ পশ্বাচারিগণের ভূয়োভূয়ো নিন্দ করিয়াছেন।

এইরূপ নিন্দার সূচনা আমরা প্রাচীন গ্রন্থেই দেখিতে পাই। প্রাচীন বৌ ও জৈন গ্রন্থে যে স্থলেই তান্ত্রিক আচার উল্লিখিত হইয়াছে, সে স্থলেই ইহা (নিন্দনীয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে অনে স্থলে ইহা দুক্কত বা দুষ্কৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। পুরাণে, এমনকি কোনে কোনো তন্ত্রেও স্পষ্টতই তন্ত্রের নিন্দাবাদ উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

পুরাণাদিগ্রন্থে কেবল তন্ত্রনিন্দাস্থলেই যে তন্ত্রশাস্ত্রকে অবৈদিক ও বেদবা বলা হইয়াছে, তাহা নহে। বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখপ্রসঙ্গে

তন্ত্রোপাসনা ও বৈদিকোপাসনা স্বতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পুরাণাদির মতে তন্ত্রোপাসনা বৈদিকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত নহে গুপ্ত-যুগে লিখিত নেপাল দরবার লাইব্রেরির নিশ্বাসতত্ত্বসংহিতা নামক তন্ত্রগ্রন্থে তন্ত্রের অবৈদিকত্ববাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সৌন্দর্য-লহরীর টীকায় লক্ষ্মীধর কৌলমার্গকে স্পষ্টই অবৈদিক বলিয়াছেন।

কোনো কোনো তন্ত্রে আবার বেদের প্রতি একটা বিরোধের ভাব দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার অপরার্ক একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বৈদিক শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে[৫]। নেপাল দরবার লাইব্রেরিস্থিত কাকচণ্ডেশ্বরীমত নামক তন্ত্রগ্রন্থের মতে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত বেদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয় না (বেদানাঞ্চ বয়োঽর্থেন ন সিদ্ধিস্তেন জায়তে)। কুলার্ণব তন্ত্রে (১১।৮৫) বেদ অপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব প্রদর্শনের জন্য বেদকে গণিকা ও তন্ত্রকে কুলবধূর সহিত তুলনা করা হইয়াছে[৬]।

কোনো কোনো পুরাণের ও তন্ত্রের মতে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য অথবা বেদবহিষ্কৃত পতিত ব্যক্তিদিগের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। বরাহপুরাণ, কূর্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি অনেক পুরাণেই এই মর্মের কথা পাওয়া যায়[৭]। বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধৃত সাম্বপুরাণের মতে শ্রুতিভ্রষ্ট ও শ্রুতিপ্রোক্ত কার্যকরণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র[৮]। ভৈরবডামরের মতে আপাততঃ সুগমরূপে প্রতীয়মান তন্ত্র দুষ্টদিগের প্রতারণার জন্য প্রণীত হইয়াছিল[৯]।

---

৫ দীক্ষিতস্য চ বেদোক্তং শ্রাদ্ধকর্মাতিগর্হিতম্।—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, আনন্দাশ্রম, পৃ. ১১

৬ বেদস্মৃতিপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব॥

৭ কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বামমার্হতম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥—কূর্ম, পূর্ব ১২।২৫৯
(এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ—পৃ. ১৩৭)

৮ শ্রুতিভ্রষ্টঃ শ্রুতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তে ভয়ং গতঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং মনুষ্যস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ॥—বীরমিত্রোদয়, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪

৯ দুষ্টানাং মোহনার্থায় সুগমং তন্ত্রমীরিতম্।—ভৈরবডামর, উত্তর ভাগ

কূর্মপুরাণের মতে বামাচারী, পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অন্যায্য[১০]। অপরার্ক-ধৃত এক স্মৃতিবাক্য অনুসারে কাপালিক, পাশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই সূর্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে।[১১]

এইসমস্ত তন্ত্রনিন্দা তান্ত্রিক আচার্যগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহাদের মতে এই নিন্দা অসদাগম বা অবৈদিক তন্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সদাগম সম্বন্ধে নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক নিন্দার উদ্দেশ্য এক মতাবলম্বীকে অন্য মত বা আচার হইতে নিবৃত্ত করা— যথেচ্ছচারিতা বন্ধ করা। ভাস্কররায় তন্ত্র-নিন্দার অন্য তাৎপর্যও নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে— তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অতিশয় কষ্টসাধ্য। যাহাতে আপাততঃ সুগমবোধে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া লোকে প্রতারিত না হয় সেইজন্যই সাধারণ লোককে এ পথ হইতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে নিন্দা করা হইয়াছে। তন্ত্রনিন্দার অন্য কারণও ছিল। তন্ত্রের কতকগুলি আচার ধর্ম ও নীতিবিষয়ে সর্ববাদিসম্মত ধারণার বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ লোক তন্ত্রোপাসনাকে সাধনার চরমপন্থা মনে না করিয়া ইন্দ্রিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের সহজ সাধন রূপে গ্রহণ করিয়া ইহার উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছিল। যে তন্ত্রানুষ্ঠানকে কুলার্ণবতন্ত্রে অতি কঠিন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে— যাহা অপেক্ষা ক্ষুরধারাশয়ন ও ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনকেও সহজ বলা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানকেই কালক্রমে সাধারণ লোকে অতি সুসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া লইল। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম-রচিত মত্তবিলাস নাটকে কাপালিক স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল—

---

১০ পাষণ্ডিনণো বিকর্মস্থান্ বামাচারাংস্তথৈব চ।
পাঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ।—কূর্ম পুরাণ, উপরিভাগ, ষোড়শ অধ্যা
(এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ, পৃ. ৫৫৫

১১ কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ শৈবাশ্চ সহ কারুকৈঃ।
দৃষ্টাশ্চেদ্ রবিমীক্ষেত স্পৃষ্টাশ্চেৎ স্নানমাচরেৎ।
—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (আনন্দাশ্রম), পৃঃ ১

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষিতব্যং
গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গো
দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিণাকপাণিঃ ॥১।৭

সুরাপান, প্রিয়তমার মুখদর্শন, স্বভাবললিত বিকৃত বেশ ধারণ প্রভৃতি যিনি মোক্ষলাভের পথ হিসাবে নির্দেশ করিয়াছেন সেই মহাদেব দীর্ঘজীবী হউন।

খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে কবিরাজ রাজশেখর-রচিত 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকেও এইরূপ কথাই দেখিতে পাওয়া যায়—

রণ্ডা চণ্ডা দিক্খিআ ধম্মদারা
মজ্জং মাংসং পিজ্জএ খজ্জএ অ।
ভিক্খা ভোজ্জং চম্মখণ্ডং চ সেজ্জা
কোলো ধম্মো কস্স নো ভাদি রম্মো ॥১।২৩।

যে ধর্ম অনুসরণ করিলে মদ্য-মাংস উপভোগ করা চলে, সেই কৌলধর্ম কাহার নিকটই-বা রমণীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় না?

মুত্তিং ভণন্তি হরিবম্হমুহা হি দেআ
ঝানেন বেঅপঠনেন কদুক্কিআএ।
এক্কেণ কেবলমুমাদইএণ দিট্‌ঠো
মোক্খো সমং সুরঅকেলিসুরারসেহিং ॥১।২৪।

হরি, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা বলেন—মুক্তি পাওয়া যায় ধ্যান, বেদপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা। কেবল উমানাথ মহেশ্বর সুরতকেলি ও মদ্যপানের সাহায্যে মোক্ষলাভের উপায় দর্শন করিয়াছেন।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থেও এইরূপ আদর্শের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

ন কষ্টকল্পনাং কুর্যান্নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
ন চাপি বন্দয়েদ্দেবান্ কাষ্ঠপাষাণমৃন্ময়ান।
পূজামস্যৈব কায়স্য কুর্যান্নিত্যং সমাহিতঃ ॥—অদ্বয়সিদ্ধি

উপবাসাদি ক্লেশ করিবে না, কাষ্ঠ-পাষাণ-মৃন্ময় দেববিগ্রহের পূজা করিবে না; কেবল এই দেহের তৃপ্তি বিধান করিবে।

সম্ভোগার্থমিদং সর্বং ত্রৈধাতুকমশেষতঃ।
নির্মিতং বজ্রনাথেন সাধকানাং হিতায় চ॥

বজ্রনাথ সাধকের উপভোগ ও মঙ্গলের জন্যই সমস্ত দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

সুখেন প্রাপ্যতে বোধিঃ সুখং ন স্ত্রীবিয়োগতঃ।—একল্লবীরচণ্ডমহারোষণতন্ত্র

সুখের মধ্য দিয়া বোধি লাভ করা যায় এবং সুখ স্ত্রী-সঙ্গ ব্যতিরেকে হয় না।

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানৈর্ন সিধ্যতি।
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিধ্যতি॥—তথাগতগুহ্যক

কঠোর নিয়মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না—সকল রকম কামোপভোগের দ্বারাই মানব আশু সিদ্ধিলাভ করে।

এইসকল মতবাদের আপাতপ্রতীয়মান অর্থ ও তদনুযায়ী আচারসমূহ তন্ত্র সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সন্দেহ নাই। জৈনদিগের ভরটকদ্বাত্রিংশিকা নামক গ্রন্থে, পরম শৈব ক্ষেমেন্দ্রের নর্মমালায় ও মাধবাচার্য-কৃত শঙ্করবিজয়ের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তান্ত্রিকদিগের অধঃপাতের চরম সীমার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু এ চিত্রকে একেবারে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তাই, অধ্যাপক বেণ্ডাল তাঁহার সম্পাদিত শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, 'অবস্থা এমন হইল যে, তন্ত্রশাস্ত্র কামশাস্ত্রের রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইল।'

ফলে, তান্ত্রিকধর্ম আধুনিক যুগে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক আচারের বিলোপ অনেক চিন্তাশীল মনীষীও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। তন্ত্র ছদ্মবেশী কামশাস্ত্র, দুর্নীতি প্রচারের জন্যই এই শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল— এইরূপ নানা কথা তন্ত্র সম্বন্ধে অবাধে প্রচার করা হইয়াছে। তাই, বর্তমান কালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগরণের ফলে ভারতের প্রাচীন সর্ববিধ সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইলেও তন্ত্রসাহিত্যের অনুশীলন নিরতিশয় মন্দীভূত।

একদেশদর্শী না হইয়া এবং পূর্ব হইতেই কোনো বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ না

করিয়া ধৈর্যসহকারে সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের তাৎপর্য আলোচনা করিলে পূর্বোল্লিখিত ধারণার অসঙ্গতি, অন্ততঃ অতিরঞ্জন, স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তন্ত্র নামে যাহা-কিছু চলিতেছে এবং তন্ত্রের নামে যে-কোনোরূপ আচারই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা সকলই ভালো— তন্ত্রের অতিবড় পৃষ্ঠপোষকগণও এরূপ কথা বলিবেন না। তন্ত্র নামে প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থেরই প্রামাণিকতা কোনো তান্ত্রিক আচার্যই স্বীকার করেন না। তন্ত্রের নাম দিয়া অনেকে নানা সময়ে যেসমস্ত কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকেন তাহারও কেহ প্রশংসা করেন না। প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যেও কালক্রমে অনেক অপ্রামাণিক অংশ প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া হিন্দুর সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানের ন্যায় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেরও অধিকার-ভেদ নির্দিষ্ট আছে। সকল আচার সকলের পক্ষে বিহিত নহে। অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান কোনো আচার বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য বিহিত হইলে তাহারই জন্য সমস্ত শাস্ত্রকে অসঙ্গত বলা চলে না। এইসমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া তন্ত্র আলোচনা করিলে পদে পদে বিতৃষ্ণা জাগিতে পারে— ভালোমন্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া উঠিতে পারে।

তন্ত্রের আদর্শ

একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তন্ত্রোক্ত উপাসনাপদ্ধতি দার্শনিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। উপাস্য ও উপাসকের— ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যানুভূতির সহায়তা করা এই উপাসনাপদ্ধতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই বিশ্বজগৎ ভগবানের অভিব্যক্তিমাত্র —এই জগতের সমস্ত পদার্থ, বিশেষতঃ মানব-শরীর, দৈবী শক্তিতে পরিপূর্ণ এইরূপ ধারণা উপাসকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্যই তান্ত্রিক উপাসনায় ন্যাস ও অন্তর্যাগাদির বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিরর্থক শব্দসমষ্টি বলিয়া যে তান্ত্রিক মন্ত্রগুলিকে অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন সেই মন্ত্রগুলিরও দার্শনিক ব্যাখ্যা তান্ত্রিকসমাজে প্রচলিত আছে। সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক,

শব্দরাশিকে তান্ত্রিকগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শব্দই দেবতার স্বরূপ, শব্দই ব্রহ্ম— এই তাঁহাদের মত। বস্তুতঃ তান্ত্রিক উপাসনার প্রতি অঙ্গেই এইরূপ দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক দর্শনও একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক সম্প্রদায়। সাংখ্যাদি দর্শনে যেরূপ কতকগুলি তত্ত্ব আছে, তান্ত্রিক দর্শনেও সেইরূপ বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা আছে। বেদান্তাদি দর্শনের সহিত ইহার সম্পর্কও বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মনে হয়, বেদান্তের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বেদান্তের অদ্বৈতবাদ তন্ত্রে প্রতি পদে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে।

শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব আচার্যগণ নিজ নিজ ধর্মমত অবলম্বনে বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাক্তগ্রন্থানুসারে শক্তি দ্বৈতসিদ্ধান্তহন্ত্রী। নীলকণ্ঠ দেবী-ভাগবতের টীকায় দেবীকে সর্ববেদান্ততাৎপর্যভূমি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মায়োপহিত তুরীয় ব্রহ্মই শাক্তের উপাস্য। চলতি কথায়ও তারাকে সচরাচর ব্রহ্মময়ী বলা হইয়া থাকে।

অবশ্য কেহ কেহ আবার তন্ত্রকে বেদান্তবিরোধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তের দুইটি অধিকরণে (২।২।৭।৮) তন্ত্রমত খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন। তবে শৈব ব্যাখ্যাকারগণের মতে কোনো কোনো শৈব সম্প্রদায় ও পাঞ্চরাত্র মতের খণ্ডন ইহাদের উদ্দেশ্য। আবার বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকরগণের মতে ইহাদের দ্বারা শৈব ও শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৃগেন্দ্রতন্ত্রে (২।১০) বেদান্তমত খণ্ডন করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধান্ততন্ত্রও বেদান্তবিরোধী, তাহাতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিকূল সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনো কোনো অংশে তন্ত্রের সহিত সাংখ্যমতের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। শৈব তন্ত্র ও চতুঃষষ্টিতন্ত্র সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সৌন্দর্যলহরীর টীকায় লক্ষ্মীধর তন্ত্রের একপঞ্চাশৎ বা ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের সহিত সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তন্ত্রের যে একটা সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি ছিল উপরের আলোচনা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠ শৈব শাক্ত সৌর গাণেশ বৈষ্ণব এই পাঁচ প্রধান তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পাঁচটি স্বতন্ত্র দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত, রসেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দর্শনের বিবরণ দিয়াছেন।

নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ব ও মহনীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের রুচি-বিগর্হিত কতকগুলি এরূপ আচার তন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি আপাত-দৃষ্টিতে সর্বসম্মত নীতিমার্গের পরিপন্থী বলিয়া মনে হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। ফলে যে-শাস্ত্রে মদ্য মাংস মৈথুন প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কারের উপভোগের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যে-শাস্ত্রে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্ট-সাধক ষট্‌কর্মের বিধান রহিয়াছে, সে শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের একটা অবজ্ঞার ভাব উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। তবে এরূপ অবজ্ঞা পোষণ করার পূর্বে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাগুলি ধীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এইসমস্ত আচারের যতই দোষ থাকুক-না কেন, এ-সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে যেসকল বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা দুর্নীতির পরিপোষক নহে, জনসাধারণকে অসৎপথে পরিচালিত করাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। পক্ষান্তরে, এইগুলির মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা ছিল শাস্ত্রকারদিগের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য এই জাতীয় আচারের মধ্য দিয়া সাধনার পথে একটুও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে মনে স্বতই সংশয় জাগরিত হয়। অথচ, ঈদৃশ আচার কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই যে বিহিত তাহা নহে। বিভিন্ন দেশে আদিম ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বা ইতোঽধিক ঘৃণাকারজনক আচারের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশের কথা জানি না, তবে তন্ত্রের এই জুগুপ্সিত আচারের অনুবর্তী প্রকৃত সাধকও একান্ত দুর্লভ নহেন। বামাক্ষেপা সর্বানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন, অথচ তাঁহারা এইসমস্ত আচারের মধ্যে অন্ততঃ কোনো কোনোটির অনুসরণ করিতেন। শক্তির উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা ভোগের মধ্য দিয়াই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া

থাকেন— একথাও তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টতই পাওয়া যায় (উমাপদাম্ভোজযুগার্চনে তু ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব)। তাই বলা হইয়াছে, 'যৈরেব পতনং দ্রব্যৈর্মুক্তিস্তৈরেব সাধনৈঃ' অর্থাৎ যেসমস্ত পদার্থ সাধারণতঃ মানুষের অধঃপতন আনয়ন করে, তন্ত্রশাস্ত্রের মতে তাহারাই (স্থলবিশেষে) মুক্তি প্রদান করে। অতএব, তন্ত্রের এই পথের রহস্য যোগীদিগেরও অগম্য (কৌলোমার্গঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ)।

ভোগবহুল এইসমস্ত তান্ত্রিক আচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং ব্যসনে—তান্ত্রিক আচার্যগণ একথা বিশেষভাবেই বুঝিতেন। তাই এ পরিণতি যাহাতে উপস্থিত না হয় এজন্য তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলন। অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশলাভ করিলে এই আচারগুলি সাধককে উন্নতির দিকে না লইয়া অবনতির পথে নামাইয়া দেয় এ-কথা তাঁহারা স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। অর্থলোভে, কামনাবশতঃ অথবা সুখলোভে যেসকল লোক এইসমস্ত আচরণে যোগদান করেন তাঁহাদিগকে রৌরব নরকে গমন করিতে হয়।[১২] শুদ্ধমাত্র ভোগলিপ্সায় যিনি মদ্যপান করিবেন তাঁহার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উত্তপ্ত মদ্যের দ্বারা যদি তাঁহার মুখ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই তিনি শুদ্ধ হইবেন, অন্যথা নহে।[১৩] ভাগবতপুরাণকার বলিয়াছেন—মদ্যাদি-ব্যবহারের প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে স্বতই বর্তমান। ধর্মলাভের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে এইসমস্ত দ্রব্যের ব্যবহারের বিধান করিয়া শাস্ত্রকারেরা সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে কতকটা নিয়মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৪]

১২ অর্থাদ্ বা কামতো বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।—তন্ত্রসার, কুলাচার-প্রকরণ

এই প্রসঙ্গে গন্ধর্বতন্ত্রের ৩৭শ পটলের উক্তিগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৩ সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দগ্ধে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।—কুলার্ণব, ২।১২৯

১৪ লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।—ভাগবতপুরাণ, ১১।৫।১১

কিন্তু এ-কথাও স্থির যে, যে-উদ্দেশ্যেই ভোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা হউক া কেন, ভোগলালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকে এবং ইহা মানুষকে সমস্ত উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক আচার্যগণ সাধারণ সাধকের জন্য এই ভাগমার্গের বিধান করেন নাই, চরম সাধকের জন্যই এই চরম মার্গের বিধান। বাধ হয় চরম সাধক লোভমোহাদি রিপুর হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহারই পরীক্ষার জন্য, সর্বপ্রকার বিকারের মধ্যেও যিনি অবিকৃত তিনিই প্রকৃত সাধক, প্রকৃত বীর— এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ বীভৎস াধনপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। যিনি এই সাধনপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন, তাঁহাকে বলা হইত বীর; কারণ, অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ এ-পথের পথিক হইতে পারে না। যে মদ্য দেবতাগণেরও মত্ততা আনয়ন করে সেই মদ্য যাহাকে বিকৃত করে না সেই প্রকৃত তান্ত্রিক।[১৫] এ-পথে যে প্রতি পদে বিপদ ও পতনের সম্ভাবনা, সুতরাং াধারাণর পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা যে শ্রেয়স্কর নহে সেদিকে তান্ত্রিক আচার্যগণ বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া— কুলমার্গের অনুবর্তীগণ ব্যতীত আর কেহই এ পথ অবলম্বন করিবেন না— ইহাই হইল সাধারণ নির্দেশ। উপযুক্ত গুরুর নিকট ইতে এই সাধনপদ্ধতির গূঢ় রহস্য ও ক্রম না জানিয়া যে-ব্যক্তি নিজে নিজেই হার সাহায্যে সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে কৃতকার্যতা লাভ করিতে তা পারেই না, পক্ষান্তরে শুধু হাতে সাঁতার দিয়া অপার সমুদ্র পার হইতে গলে যেরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হয় সেইরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।[১৬] াড়্গধারার উপর দিয়া গমন করা, বাঘের গলা জড়াইয়া ধরা, সাপ ধরিয়া রাখা

---

১৫ অহো পীতং সুরাদ্রব্যং মোহয়েত্রিদশানপি।
তন্মধ্যং কৌলিকঃ পীত্বা বিকারং নাপ্নুয়াত্তু যঃ।
মন্ত্র্যানৈকপরো ভূয়াৎ স ভক্তঃ স চ কৌলিকঃ।—পরানন্দমত (বরোদা) পৃ ১৬

১৬ কুলধর্মমজানন্ যঃ সংসারান্মোক্ষমিচ্ছতি।
পারাবারমপারং সঃ পাণিভ্যাং তর্তুমিচ্ছতি।—কুলার্ণব ২।৪৭

প্রভৃতি সমস্ত দুষ্কর কার্য অপেক্ষা দুষ্কর— একরূপ অসাধ্য— এই সাধনপথ।[১৭] সুতরাং সাধারণের পক্ষে এ-পথ অবলম্বন করা আদৌ বিধেয় নহে। শাস্ত্রে এইসকল স্পষ্ট উক্তি অনুধাবন করিলে কাহারও মনে কি এরূপ সন্দেহ জাগিতে পারে যে, সাধারণকে অসৎ পথে প্ররোচিত করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি ?

তার পর, তন্ত্রের এইসমস্ত আপত্তিজনক আচার সকল সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত নহে এবং কোনো কোনো সম্প্রদায় এইসমস্ত আচারের রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সকল আপত্তির মূল উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরশ্চর্যার্ণবাদি গ্রন্থের মতে এইসমস্ত আচার ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের স্বাভাবিক নৈতিক উৎকর্ষই বোধ হয় এইরূপ নিষেধের নিদান। বিভিন্ন নিম্নজাতির নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্যই বোধ হয় মূলতঃ এইসব আচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নানা দেবতার মধ্যে তারার উপাসনায় এই জাতীয় আচার বা বামাচার অবশ্যপালনীয়— এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু নিজ গাত্রের রুধির দান প্রভৃতি কার্য আবার এই উপাসনায়ও এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে শাক্তদিগের মধ্যে এইসকল আচারের একচ্ছত্র আধিপত্য, তাঁহাদেরও সকল সম্প্রদায় ইহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। কাপালিক, ক্ষপণক, দিগম্বর প্রভৃতি কৌল সম্প্রদায়ের আচার তান্ত্রিকাচার্য লক্ষ্মীধর তাঁহার আনন্দলহরীর টীকায় বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি সময়াচারের অনুবর্তী। সময়মতে এবং পূর্বকৌল-মতে আন্তরযাগ বা মানসপূজারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনোরূপ ন্যক্কারজনক আচার তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। অনেক স্থলে এইসমস্ত আচারের রূপক অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সময়মতে তান্ত্রিক পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান একেবারেই আদৃত হয় নাই। লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন— সময়মতে মন্ত্রের পুরশ্চরণ নাই, জপ নাই, বাহ্য হোম

১৭ কৃপাণধারাগমনাদ্ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্তনম্ ।—কুলার্ণব ২

াই, বাহ্য পূজা নাই ; এই মতে হৃৎকমল-মধ্যেই সমস্ত পূজার অনুষ্ঠান করিতে ইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, মানস ধ্যানই এই পূজার প্রধান অঙ্গ, াবং ইহা যে অতি উচ্চ অঙ্গের উপাসনা ও সকল উপাসনার আদর্শভূত তাহা র্ববাদিসম্মত। তন্ত্রের অনতিপরিচিত পরানন্দমতাবলম্বিগণের সাধনপদ্ধতির ধ্যেও অনেক উচ্চস্তরেব বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তান্ত্রিক উপাসনা হইলেও হাতে হিংসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তান্ত্রিক আচারের যে আধ্যাত্মিক অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত ৎকৃষ্ট সাধনপদ্ধতির অনুকূল। মৎস্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চ 'ম'কারেরই এইরূপ াধ্যাত্মিক অর্থ করা হইয়াছে। নির্বিকার, নিরঞ্জন যে পরম ব্রহ্ম তাঁহার র্ণানন্দময় জ্ঞানকেই মদ্য বলে।[১৮] যে কর্ম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ রা হয় তাহারই নাম মাংস।[১৯] কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত শিবের কাল্পনিক ংযোগই মৈথুন।[২০]

কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ যাহাই হউক-না কেন, অনেকেই সেই নির্দেশ অনুসারে ার্য করিতেন না বা করিতে পারিতেন না। তান্ত্রিক আচারের অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে া এই অনুষ্ঠানের নামে অনেকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করিতেন— মদ্য-মাংসাদির াযথা বহুল ব্যবহারে লিপ্ত হইতেন এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া ারক্তির ভাজন হইতেন। সাধারণ লোকে ভাবিত— মদ্যাদিসেবন তান্ত্রিক পাসনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এক দল অসাধু চরিত্রের লোক এইরূপ তবাদ যে প্রচার করে নাই তাহাও বলা যায় না। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের ধ্যে এই জাতীয় কথা প্রক্ষিপ্ত করা অথবা এইসব মতবাদ তন্ত্রাকারে রচিত

১৮ যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্তিতম্।—বিজয়তন্ত্র

১৯ মাং সনোতি হি যৎ কর্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম্।
ন চ কায়প্রতীকস্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে।—বিজয়তন্ত্র

২০ কুলকুণ্ডলিনীশক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্।—বিজয়তন্ত্র

গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রচার করা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং অনেকে এরূপ করিতেন বলিয়াও আশঙ্কা হয়। বস্তুতঃ, কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্থে এ-জাতীয় ব্যাপারের উল্লেখও যে না-পাওয়া যায় এমন নহে। কুলার্ণবে বলা হইয়াছে— সম্প্রদায়বর্জিত ও গুরূপদেশরহিত অনেকে নিজবুদ্ধি অনুসারে কৌলধর্মের কল্পনা করিয়া থাকেন।[২১] পূর্বেই বলা হইয়াছে, যামুনাচার্য প্রভৃতির মতে অর্বাচীনকালে তন্ত্রের নামে তন্ত্রবিরোধী বস্তুসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। এইসব কারণেই বোধ হয় তন্ত্রে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গেসঙ্গে অতি নীচ ও কুৎসিত বিষয়সমূহের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, লক্ষ্মীধর ভাস্করাচার্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকাচার্যগণকর্তৃক একবাক্যে নিন্দিত এইসমস্ত বিষয়ের জন্য সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত তন্ত্রসাহিত্যের বহুল প্রচার ও সুনিয়ন্ত্রিত সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা হওয়া দরকার। এই সমালোচনার ফলে প্রতি গ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ ও সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণীত হইবে— তন্ত্রের নিগূঢ় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তন্ত্রসাহিত্য অতি বিশাল— ব্যাপকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এ-কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আশার বিষয়, কোনো কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের দৃষ্টি এ-দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অপাংক্তেয় তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

তন্ত্র ও বাঙালী

অনেকের ধারণা— বাংলাদেশেই তন্ত্রের উৎপত্তি, এই দেশেই এই শাস্ত্রের আচার পরিপুষ্টি লাভ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বীভৎস ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এইরূপ ধারণা দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, এই ধারণা সত্য নহে। তান্ত্রিক ধর্ম— এমনকি ইহার বিকৃত ও বীভৎস আচার অনুষ্ঠান—যে কেবল বাংলা-দেশের চতুঃসীমার

---

২১ বহবঃ কৌলিকং ধর্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্যবিবর্জিতাঃ।—কুলার্ণব ২।১১৬

ধ্যেই আবদ্ধ নহে, ভারতের সর্বত্রই যে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল ইতে বাংলাদেশের ন্যায়ই প্রচলিত আছে তাহা দেখাইবার জন্য কষ্টকল্পনা । অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় প্রমাণের াহায্যেই ইহা প্রতিপাদিত হইতে পারে।

ভারতের সর্বত্র দীর্ঘকাল যাবৎ তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচিত হইয়া াসিতেছে, বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অজস্র পুথি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্যন্ত নানা প্রদেশের যে সমস্ত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইযাছে সেগুলি ালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় কোনো প্রদেশেই তন্ত্র আগম বা মন্ত্র াস্ত্রের পুথির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরম্ভ রিয়া তাঞ্জোর পর্যন্ত যেসমস্ত স্থানের (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, যোধ্যা, কাশী, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বাংলা প্রভৃতি) ুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সর্বত্রই স্থানীয় বা স্থানান্তরের অক্ষরে লিখিত াচীন অপ্রাচীন বহু তন্ত্রের পুথি পাওয়া যায়। এইসকল পুথি নাগরী বাংলা ড়িয়া শারদা নেওয়ারী গ্রন্থ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লিপিতে লিখিত। ত্তর-ভারতের নানা স্থান হইতে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে সহস্রাধিক ন্ত্রের পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থাক্ষর ব্যতীত ন্য সমস্ত অক্ষরের পুথি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির অক্ষর শ প্রাচীন এবং অপরগুলির অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কয়েকখানি অতি াচীন পুথিও এই পুথি-সংগ্রহের মধ্যে বর্তমান আছে।

এই পুথিগুলিই বাংলার বাহিরে তন্ত্রচর্চার একমাত্র প্রমাণ নহে। বাংলার হিরে যুগে যুগে নানা তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে তকগুলি সারা ভারতে পরিচিত ও আদৃত। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'তান্ত্রিক াচার্য ও সাধক' অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

এইসকল গ্রন্থ ও বিশেষ করিয়া নানা তান্ত্রিক কৃত্যের ছোট ছোট পদ্ধতির ুথি হইতে বিভিন্ন প্রদেশের আচারের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকটিত হয়। ংলার তান্ত্রিক সমাজে বা তন্ত্র-গ্রন্থে যেসমস্ত অনুষ্ঠান ও দেবতার উপাসনার

প্রচলন বা উল্লেখ আছে তাহার অনেক বেশি অনুষ্ঠান ও বেশি দেবতার নিয়মি
উপাসনার উল্লেখ বাংলার বাহিরের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাংলায় কেবল কা
তারা ষোড়শী দুর্গা শিব কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দেবতার উপাসক দেখিে
পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাংলার বাহিরে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার বহু বিভি
রূপের উপাসকের উল্লেখ আছে। কোনো বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবত
বিশেষের সাময়িক পূজা অবশ্য বাংলাদেশেও অপ্রচলিত নহে। ত
বগলামুখী চণ্ডিকা গায়ত্রী রাজ্ঞী কুব্জিকা সারিকা বটুকভৈরব গণেশ পরমহং
প্রভৃতি দেবতার নিয়মিত উপাসনার বিধান—এইসকল দেবতার মন্ত্রে দীক্ষি
হইয়া ইষ্টদেবতারূপে ইহাদিগকে পূজা করিবার প্রথা বাংলাদেশে নাই, বাংলা
বাহিরে আছে। তবে বাংলার বাহিরে মূর্তিপূজা অপেক্ষা দেবতার যন্ত্র নাম
তান্ত্রিক প্রতীকের পূজাই বেশি প্রচলিত। অনেকের ঘরেই শক্তি বা অ
দেবতার যন্ত্র সাদরে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। বামাচারের বীভং
অনুষ্ঠান এবং মারণ বশীকরণ প্রভৃতি আপাততঃ ঘৃণ্য কৃত্য সম্বন্ধেও বাংল
বাহিরে বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বাংলায়, শুধু বাংলায় কেন, নেপাল ও কাশ্মীর ছাড়া সারা উত্তর-ভারে
প্রচলিত তন্ত্রসাহিত্য বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে। ইহাতে নানা দেবতার পূজা
আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তান্ত্রিক দর্শনে
গুরুত্বপূর্ণ গভীর রহস্যের আলোচনা এ অঞ্চলে তেমন আদর পাইয়াছে বলি
মনে হয় না। দক্ষিণ-ভারত ও কাশ্মীরে প্রচলিত প্রাচীন ও অর্বাচীন তন্ত্রগ্র
আলোচনা করিলে তন্ত্রের সাধনার যে মহনীয় ভাবের আভাস পাওয়া যায় অন্য
প্রচলিত তন্ত্রসাহিত্যে তাহা দুর্লভ।

শৈবশাক্তপ্রধান বাংলাদেশে শৈবশাক্ত তন্ত্রেরই প্রাধান্য দেখিতে পাও
যায়। ইহা হইতে অনেকে ধারণা করিয়াছেন যে, শক্তির উপাসনাই তন্ত্রে
একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই বাংলাদেশেই বৈষ্ণব-তন্ত্রেরও অভাব নাই
বাংলার বাহিরে সূর্য গণেশ প্রভৃতি দেবতার তান্ত্রিক উপাসক আছেন এবং সে
উপাসনার বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের তন্ত্রগুলি বাংলার বাহিরে তেমন পরিচিত নয়। বস্তুতঃ এক দেশের প্রচলিত তান্ত্রিক সাহিত্য প্রায়শঃই অপর প্রদেশে প্রচলিত বা পরিচিত [।]। বামকেশ্বর তন্ত্র, প্রপঞ্চসার বা শারদাতিলকের মত কয়েকখানি গ্রন্থের র্বত্রিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তবে অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রচার ও চলন প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলার কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থও বাংলার বাহিরে অবঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত আকারে পাওয়া যায়। হাদের মধ্যে বাঙালীর বিশেষ আদরের তন্ত্রসারের নাম উল্লেখযোগ্য। নেপালের ।ওয়ারী অক্ষরে লিখিত ইহার দুই খানি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে াছে। ইহা ছাড়া, নাগরী অক্ষরে লিখিত ইহার অংশবিশেষের খণ্ডিত পুঁথিও াসাইটিতে আছে। নাগরাক্ষরে লিখিত তন্ত্রসারের একখানি পুথি তাঞ্জোরের াসাদ লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রসার ব্যতীত অন্যান্য কয়েকখানি ন্থেরও এইরূপ পুথি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যদুনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্ররত্নাকর, র্ণানন্দের শাক্তক্রম ও কৃষ্ণবিদ্যাবাগীশের তন্ত্ররত্নের নাগরাক্ষরে লিখিত পুথি ও র্ণানন্দের তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণীর ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে াছে। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার কৃত শ্যামাসপর্যাবিধি নামক অপেক্ষাকৃত াধুনিক একখানি গ্রন্থের পুথি মাদ্রাজের ওরিয়েন্টল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটীতেও নাগরীতে লিখিত এই গ্রন্থের একখানি থি আছে। এইসকল পুথি বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর গ্রন্থের আদরের প্রত্যক্ষ মাণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তন্ত্রসাহিত্যের গৌরবস্বরূপ অভিনব গুপ্ত, ভাস্কররায় াভৃতি মনীষি কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের কোনো পুথি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। ারশুরামকল্পসূত্র ও প্রপঞ্চসারের পুথিও বাংলাদেশে বিরল।

বাংলাদেশে যেসমস্ত তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত বা বিশেষ পরিচিত প্রায় র্ধশতাব্দী পূর্বে সেগুলি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই কার্যে সিকলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবিধমূলতন্ত্র ও বিধতন্ত্রসংগ্রহ নাম দিয়া তিনি বাংলাদেশের অনেকগুলি তন্ত্র প্রকাশ রিয়া ছিলেন। তাঁহার অরুণোদয় নামক মাসিক পত্রেও এইরূপ অনেক গ্রন্থ

প্রচারিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ও বাংলার কতকগুলি মূল্যবা তান্ত্রিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্থূলভতন্ত্রপ্রকাশ নাম দিয়াও একবা কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙালীর তন্ত্রসাহিত্য সংরক্ষণ বিষে উপরিনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তন্ত্রসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই ঋ অপরিশোধ্য। তবে ইঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় অবাঙালী নিকট ইহা পরিচিত ও আদৃত হইবার অবকাশ পায় নাই।

বাংলার যেসমস্ত তন্ত্রগ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তদতিরিক্ত অন্যা অনেক গ্রন্থের পুঁথি এখনও নানাস্থানে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, প্রকাশি গ্রন্থগুলিরও বিশ্লেষণ ও বিচারপূর্ণ আলোচনা এখনও হয় নাই। সে আলোচন না হইলে তন্ত্রসাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ ও মূল্য নির্ণয় করা যাইবে না।

তন্ত্রশাখা ও তন্ত্রসাহিত্য

উপাস্য দেবতা ও উপাসনার পদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগ বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য গণেশের উপাসকগণ যথাক্রমে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সৌর ও গাণেশ বা গাণপত সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে (৫৷৯২৷৩) বৈষ্ণব গাণপত্য শৈ স্বায়ম্ভুব চান্দ্র পাশুপত চীন জৈন কালমুখ বৈদিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাহিসাবে শৈব শা বৈষ্ণবগণই প্রধান। কোনো কোনো সম্প্রদায় তো একেবারে অপরিচিত অনেক স্থলে এক সম্প্রদায় বহু শাখায় বা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদে বিস্তৃত পরিচয় দুর্লভ। বিভিন্ন শাখার মধ্যে নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি পার্থক প্রচুর। ফলে কোনো গ্রন্থ বা কোনো মতের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইলে তাহা কোন্ শাখার বা কোন্ উপশাখার তাহা বিশেষভাবে জান দরকার। অথচ এ বিষয়ে এখনও যথোপযুক্ত অলোচনা হয় নাই—দীর্ঘকাল পূ উইলসন, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর যে আলোচন করিয়াছিলেন তাহা মূল্যবান্ হইলেও পর্যাপ্ত নহে।

শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান চারি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের াম সম্পর্কে মতভেদ আছে। বেদান্তসূত্রের (২।২।৩৭) ভামতী টীকার মতে াহেশ্বরদিগের চারি শাখা— শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্তী ও কাপালিক। বদান্তভাষ্যকার ভাস্করাচার্য কারুণিক সিদ্ধান্তীর স্থলে কাঠক সিদ্ধান্তী নামের ল্লেখ করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাস তাঁহার বেদান্তকৌস্তুভ ্রন্থে এবং বেদোত্তম তাঁহার পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্যে ইহার স্থানে কালামুখ নামক াখার নাম করিয়াছেন। শবভস্মস্নান, কপালপাত্রভোজন, লগুড়ধারণ, সুরাকুম্ভ-্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সাহায্যে পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে— ইহাই এই াখার অনুবর্তীদিগের ধারণা[২২]।

বীরাগম নামক গ্রন্থে[২৩] সামান্য শৈব, পূর্বশৈব, মিশ্রশৈব এবং শুদ্ধশৈব এই ারিটি শৈব শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো পুরাণে বাম, পাশুপত, াগুড়, কাপাল, ভৈরব, সোম প্রভৃতি শাখার উল্লেখ আছে। এগুলি বেদবাহ্য লিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের দুইটির নাম পূর্বোল্লিখিত প্রধান চারি াখার মধ্যে আছে— অপর শাখাগুলির সহিত পূর্বোক্ত শাখাগুলির কোনো ম্পর্ক আছে কি না বলা দুষ্কর। লাগুড়, নাকুল, লাকুল বা লাঙ্গল সম্প্রদায় ও কুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় অভিন্ন মনে হয়। পাশুপতসূত্র, গণকারিকা ও াধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃত পরিচয় াওয়া যায়। সোম সম্প্রদায় কামাত্মবাদী ও দ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া নে হয়। নামসাদৃশ্যে অনুমান হয়, এই সম্প্রদায়ের সহিত তন্ত্রোক্ত চন্দ্রজ্ঞান বিদ্যা ও কলাবাদের সম্পর্ক ছিল। কাপাল সম্প্রদায়ের সহিত এই সম্পর্কের কথা ক্ষ্মীধর তাঁহার সৌন্দর্যলহরীর টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

---

২২ তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবভস্মস্নান—তৎপ্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুম্ভ-্থাপন-তদাধারদেবতাপূজাদিকমৈহিকামুষ্মিকসকলফলসাধনমভিদধতি, শ্রীভাষ্য ২।২।৩৫

২৩ আদৌ সামান্যশৈবং তু পূর্বশৈবং দ্বিতীয়কম্।
মিশ্রশৈবং তৃতীয়ং তু শুদ্ধশৈবং চতুর্থকম্॥
—Descr. Cat. Mad. Govt. Oriental Mss. Library, ১২।৫৫০২

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ও দাক্ষিণাত্যে: সিদ্ধান্তাগমেব অনুবর্তী সম্প্রদায় এবং বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বিশে: প্রভাবশালী। কণ্ঠে শিবলিঙ্গ ধারণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বীবশৈবদিগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শৈবসিদ্ধান্ত মতাবলম্বীরা সাত ছয় পাঁচ চার বা তিন ত: মানিয়া থাকেন। তত্ত্বগুলির নাম শিব পতি পশু শুদ্ধমায়া অশুদ্ধমায়া কর্ম ও আণব। শিব ও পতি, শুদ্ধমায়া ও অশুদ্ধমায়া এবং মায়া, কর্ম ও আণবের ভে স্বীকার করা বা না করার উপর তত্ত্বসংখ্যাব হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। কেহ এ সমস্ত ভেদ স্বীকার করেন— কেহ কেহ আদৌ স্বীকাব করেন না বা কোনে কোনোটি স্বীকার করেন। দার্শনিক তত্ত্ববিচারের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের মধে ভক্তিভাবের প্রাবল্যও অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়।

শাক্তদের মধ্যে বহুবিধ আচার বা উপাসনা পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় দিব্য, বীর, পশু, বাম, চীন, দক্ষিণ, সময়, কুল প্রভৃতি নাম তন্ত্রগ্রন্থে অহর চোখে পড়ে। এক-এক সম্প্রদায়, গুর বা দেবতার পক্ষে এক-এক শ্রেণী আচার বিহিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে (পুরশ্চর্যার্ণব—৮৫ ব্রাহ্মণের পক্ষে পশুভাব ব্যতীত অন্য ভাব অবলম্বন নিন্দনীয়। তন্ত্রসারের নির্দে — ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য মাংস ব্যবহার করিবেন না— পঞ্চমকারে অবাধ ব্যবহার চতুর্থাশ্রমী বা সন্ন্যাসীর পক্ষেই বিহিত। তারারহস্যে ব হইয়াছে— তারার উপাসনায় বামাচার অবশ্য অবলম্বনীয়, আবার স্বগা: রুধিরদান কালীপূজায় বিহিত এবং তারাপূজায় নিষিদ্ধ। এই স্বগাত্ররুধি দানও ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণের পক্ষেই বিহিত— সকলের পক্ষে নহে।

বাম, বীর, চীন ও কুলাচারে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার এবং শব-সাধন অনুষ্ঠানেব ব্যবস্থা আছে। দিব্য, দক্ষিণ ও পশ্বাচারে পূজাদি সাধারণ ভা অনুষ্ঠিত হয়। সময়াচারীরা পূজার কোনো বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন কে না। অল্পপরিচিত পারানন্দ বা পরমানন্দ মতাবলম্বীদের মতে ন্যাস ও ব ব্যতীত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্ত কোনো অনুষ্ঠানই নিষিদ্ধ নহে। তন্ত্রম যেখানে ছাগবলি বিহিত হইয়াছে, এই মতে সেখানে পিষ্টকনির্মিত ছাগ

লির ব্যবস্থা করা হইয়াছে[২৪]। হিংসা এই মতে নিষিদ্ধ হইলেও রাজার পক্ষে হিত। রাজা পারানন্দ মত অবলম্বন করিলেও যুদ্ধ করিতে পারেন, গুনীয়কে দণ্ড দিতে পারেন, মুনি-ঋষিদের তপোবিঘ্নকারী হিংস্র ব্যাঘ্রাদিকে (করিতে পারেন, এমনকি কালীর সম্মুখে বলিও দিতে পারেন।

অন্যান্য শাখার মধ্যে গৌড়-শাখা, কেরল-শাখা, দিগম্বর-শাখা ও ক্ষপণক-াখার নাম উল্লেখযোগ্য। গৌড়-শাখার বৈশিষ্ট্য— বাম হস্তে পূজন, দক্ষিণ স্তে তর্পণ; আর কেরল শাখার বৈশিষ্ট্য— দক্ষিণ হস্তে পূজন, বাম হস্তে তর্পণ (রশ্চর্যার্ণব, পৃ ৮৬৭)। সাধারণতঃ জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই দিগম্বর ও পণক নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যলহরীর টীকাকার লক্ষ্মীধরের মতে বামাচারী, ক্ষণাচারী, দিগম্বর, ক্ষপণক— ইহারা সকলেই কুলাচারীর উপশাখা।

বিভিন্ন শাখা ও তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখিতে াওয়া যায়। লক্ষ্মীধর ও ভাস্কররায় সময় ও কুল শব্দের বিভিন্নরূপ ব্যুৎপত্তি তাৎপর্য নির্দেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মীধরের মতে সময়াচারীরা কোনো বাহ্যিক নুষ্ঠান করেন না— তাঁহাদের জপ নাই, হোম নাই, বাহ্য পূজা নাই। ভাস্কর-য় কিন্তু এক শ্রেণীর সময়াচারীদের মদ্য ব্যবহারের কথাও বলিয়াছেন (ত্রিপুরা হোপনিষদ্ ভাষ্য—১৫)। লক্ষ্মীধর সময়াচারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন— ক্ষান্তরে শৈবসিদ্ধান্তপরিভাষায় সময়াচারীদের সিদ্ধান্ত শ্রবণের অধিকারও াকার করা হয় নাই যেহেতু তাহাদের পশুভাব তিরোহিত হয় নাই (পৃ ৫)।

কেহ কেহ বলেন—স্বকল্পোক্ত আচারই কুলাচার। যে দেবতার পক্ষে রূপ আচার নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই দেবতার উপাসনায় সেই আচার যিনি পালন রেন তিনিই কৌলিক[২৫]। পঞ্চতত্ত্ব বলিতে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব

২৪ ইয়ানেব বিশেষোক্তি মন্মতে মুনিসত্তমাঃ।
ন ন্যাসো ন চ হিংসাস্তি জঙ্গমস্য জড়স্য বা।
হিংসাং কুর্যাত্তু বিহিতাং জড়স্যৈব ন চান্যতঃ।
আলভেত ছাগবরং যত্র স্যাত্তত্র পৈষ্টকম্।—পরমানন্দমত-সংগ্রহ
(এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৬ক, ৭খ)

২৫ স্বকল্পোক্ত আচার এব কুলাচারঃ। তদুক্তং নির্বাণতন্ত্রে একাদশপটলে
যস্মিন্ দেবে য আচারো নির্দিষ্টো মন্ত্রসাধনে তদাচারবিশিষ্টো যঃ কৌলিকঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।

এবং ধ্যানতত্ত্ব বুঝায়—পঞ্চমকারই পঞ্চতত্ত্ব নয় (নির্বাণতন্ত্র, ১২শ পটল
সুতরাং বৈষ্ণবদের মধ্যেও কুলাচার এবং বামাচার আছে। সময়াচারও
শাক্তদের নয়, শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই নামের আচার বর্তম
ছিল।

বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বিশে
উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়, মাধ্বসম্প্রদায় ও তদনুবর্তী বলি
পরিচিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী।

ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বীদের বা শুধু ভারতবাসীদের মধ্যেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠ
সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে এবং দ্বীপময় ভারতেও ইহ
ব্যাপক প্রচলন ছিল। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের *Introduction to Tantr*
Buddhism এবং শ্রীমোহনলাল ভগবান্ দাস ঝাভেরির *Comparative an*
Critical study of Mantrasastra (with special treatment
Jain Mantravada) নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রাচার সম্পর্কে অনে
মূল্যবান্ তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বীপময় ভারতের তন্ত্রধর্ম সম্পর্কে স্বত
কোনো ব্যাপক আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদ
মহাশয়ের কাম্বোজদেশ, চম্পা ও সুবর্ণদ্বীপ বিষয়ক গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এ সম্পে
কিছু-কিছু খবর দেওয়া হইয়াছে।

উপরে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির দার্শনিক তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের বিচা
বিশ্লেষণকে ভিত্তি করিয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মে
আছে উপনিষদ্, সূত্র, মূলতন্ত্র, টীকাটিপ্পনী, নিবন্ধ ও পদ্ধতিগ্রন্থ। মূলতন্ত্রগু
দেবমুখনিঃসৃত বলিয়া পরিগণিত। কতকগুলি তন্ত্রের বক্তা শিব, শ্রোত্রী পার্বতী
কতকগুলির বক্ত্রী পার্বতী, শ্রোতা শিব। এইগুলি যথাক্রমে আগম ও নিগ
নামে প্রসিদ্ধ। যাহা শিবের মুখ হইতে আগত, গিরিজার মুখে গত এব
বাসুদেবের অভিমত তাহাই আগম। আর যাহা গিরিজার মুখ হইতে নির্গত
গিরিশের কর্ণে প্রবিষ্ট এবং বাসুদেবের অভিমত তাহা নিগম। শিবের বিভি
মুখ হইতে নির্গত বিভিন্ন তন্ত্রশ্রেণী পূর্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়

্াম্নায় নামে প্রসিদ্ধ। কতকগুলি তন্ত্র যামল, ডামর ও উড্ডীশ শ্রেণীর ্র্গত। ইহাদের মধ্যে মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি আভিচারিক অনুষ্ঠানের বিবরণ ওয়া হইয়াছে।

তান্ত্রিক উপনিষদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। মাদ্রাজের আডায়ার লাইব্রেরি তে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তদের প্রায় চল্লিশখানি উপনিষদ্ উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগীর ্াসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত যোগোপনিষদের খ্যা কুড়ি। আর্থার অ্যাভেলন তাঁহার তন্ত্রগ্রন্থমালায় ভাস্কররায়, লক্ষ্মীধর অপ্যয়দীক্ষিতের ব্যাখ্যা সহ কৌলোপনিষদ্ ত্রিপুরামহোপনিষদ্ প্রভৃতি য়কখানি উপনিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এইসকল উপনিষদের মধ্যে খানি বৈদিক ও প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

তন্ত্রসাহিত্যে উপলভ্যমান সূত্রগ্রন্থের সংখ্যা খুব কম। শাক্তসম্প্রদায়ের বিদ্যারত্নসূত্র ও পারানন্দসূত্র এবং শৈবসম্প্রদায়ের শিবসূত্র ও পাশুপতসূত্র কাশিত হইয়াছে। তবে সূত্র বলিয়াই যে এগুলি অতি প্রাচীন তাহা বলা ল না। শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রের রচয়িতা হিসাবে গৌড়পাদাচার্যের নাম উল্লিখিত । কাশ্মীর শৈবসম্প্রদায়ের মুখ্যগ্রন্থ শিবসূত্র স্বয়ং শিবকর্তৃক রচিত বলিয়া সিদ্ধ হইলেও ইহা খ্রীস্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে বসুগুপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত ও চারিত হয়।

মূলতন্ত্রের সঠিক সংখ্যা বা স্বরূপ নির্ধারণ করা দুরূহ। ইহাদের নামের কাধিক তালিকা পাওয়া যায় সত্য, তবে এই তালিকাগুলিকে সম্পূর্ণ বলা চলে । এইসব তালিকায় অনুল্লিখিত অনেক গ্রন্থ নিবন্ধ-গ্রন্থাদিতে প্রমাণরূপে ধৃত হইয়াছে। এই জাতীয় অনেক গ্রন্থের পুথিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ক্ষান্তরে তালিকার অন্তর্ভুক্ত অনেক গ্রন্থের কোনো উল্লেখ নিবন্ধ-গ্রন্থে পাওয়া য় না— তাহাদের কোনো পুথির সন্ধানও মিলে না। গ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ । প্রাপ্ত পুথিও সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে। একই নামের গ্রন্থের বিভিন্ন রূপ নেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে ়, প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একখানি কুলার্ণবের পুথি পাওয়া গিয়াছে।

হইতে পারে, ইহা বিশাল কুলার্ণব গ্রন্থের একটি অংশের পুথি— প্রকাশ
সংস্করণ আর-এক অংশের। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অংশ বলিয়া উল্লিখিত অসং
স্তব কবচাদির সন্ধান বহুস্থলেই মূলগ্রন্থের প্রকাশিত সংস্করণ বা পুথিতে পাও
যায় না। এরূপ অবস্থায় অনেক গ্রন্থেরই প্রামাণ্যসম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু ব
চলে না। এইসমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তালিকাগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে-
এইগুলি হইতে তন্ত্রসাহিত্যের বিশালতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে

একটি তালিকায় স্থান অনুসারে গ্রন্থগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে
অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা নামক তিনটি স্থানের প্রত্যেক স্থানের গ্রন্থে
সংখ্যা চৌষট্টি। বারাহীতন্ত্রের তালিকায় কতকগুলি তন্ত্রগ্রন্থের পরিমাণ নির্দে
প্রসঙ্গে ইহাদের বিপুল বিস্তারের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু স্বতন্ত্র তালিকাও পাওয়া যায়। বামকেশ
তন্ত্রের (নিত্যাষোড়শিকার্ণব, ১।১৪-২২) তালিকা কৌল সম্প্রদায়ের বলি
মনে করা হয়। ইহাতে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের নাম আছে। ইহার অনেক নাম
অপরিচিত। পরিচিত নামের মধ্যে রুদ্রযামল, কুলচূড়ামণি প্রভৃতি কয়েক
নাম উল্লেখযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয়, এই তালিকায় অতিপ্রসিদ্ধ কুলার্ণবের ন
নাই। তবে চন্দ্রকলা বিদ্যাপ্রতিপাদক যে আটখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া য
তাহাদের মধ্যে ইহার নাম আছে। সময়াচার সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি শুভাগমপঞ্চ
নামে পরিচিত। বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎকুমার প্রণীত পাঁচখা
সংহিতাই এই শুভাগমপঞ্চক।

বৈষ্ণবদের মধ্যে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের আগমের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টোত্ত
শত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন তালিকার বিভিন্ন নাম একসঙ্গে মিলাই
এই সংখ্যা দুইশতের উপর দাঁড়ায়। অটো শ্রাদের নামগুলি একত্র সংক
করিয়াছেন। কোনো তালিকায় অনুল্লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধানও তি
দিয়াছেন। দেবামৃত পঞ্চরাত্রের নাম তিনি করেন নাই। ইহার একখানি পু
নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার বিব
দিয়াছেন। একাদশ পটলে সমাপ্ত এই গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রতিমা ও বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠ

়থা আছে। ইহা সনৎকুমার ও লোকপিতামহের উক্তিপ্রত্যুক্তির আকারে ়থিত। আর-একখানি বিচিত্র গ্রন্থের পুঁথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে াছে। ইহার নাম মহাকাল পঞ্চরাত্র— ইহা একখানি শাক্ত গ্রন্থ। বস্তুতঃ ঞ্চরাত্র শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ধারণ করা কঠিন। তবে অবৈষ্ণবদের ম্পর্কেও ইহার ব্যবহার একেবারে অজ্ঞাত নহে। শিবরাত্রিব্রতের অনুষ্ঠান াঞ্চরাত্রবিধানে করিবার ব্যবস্থা শিবরহস্যোক্ত শিবরাত্রিব্রতকথায় দেখিতে পাওয়া ায়। নারদ পঞ্চরাত্রে (১।১।৫৬-৫৭) ব্রাহ্ম শৈব প্রভৃতি সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের ল্লেখ করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে (৩৯।১) পঞ্চরাত্র প্রসঙ্গে সপ্তরাত্রের কথা মাছে।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যেও নানা তন্ত্রের ্রচলন ও সমাদর আছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলার বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ গীতমীয় তন্ত্রের নাম করা যাইতে পারে।

শৈবদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তীদের আগমসংখ্যা অষ্টাবিংশতি। াদ্রাজ ওরিয়েণ্টল লাইব্রেরির আগমপুরাণনামানুক্রমণিকা ও আগমগ্রন্থসংখ্যা ামক গ্রন্থে ইহাদের নাম ও পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার শবার্চনচন্দ্রিকা গ্রন্থে যে তালিকা দিয়াছেন পূর্বোল্লিখিত তালিকার সহিত তাহার ়বাংশে মিল নাই। তাঁহার মতে অষ্টাবিংশতি আগম দিব্যাগম— ইহার উপভেদ ২০৮। ভাস্কররায়ও তাঁহার ললিতাসহস্রনামভাষ্যে ইহাদিগকে বদানুযায়ী পরমেশ্বরমুখোদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শিবার্কমণি-দীপিকা ামক বেদান্তভাষ্যে (২।২।৩৮) বায়ুসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখানো ়ইয়াছে এই অষ্টাবিংশতি আগম বেদবিরোধী। সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় ়হাদের প্রচুর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একদিকে আছে দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ— অপর দিকে আছে ভক্তিভাবের অপূর্ব অভিব্যক্তি।

ইহা ছাড়া কাশ্মীরীয় শৈবদের সমৃদ্ধ সাহিত্য তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্বতন্ত্র গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনাও আছে।

শাক্ত শৈব বৈষ্ণব ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিশেষ কিছু পাওয়া যায়

না। কেবল গাণপত্য সম্প্রদায়ের সামান্য কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কুমারসংহিতা বিনায়কসংহিতা এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরির গণেশকল্পের নাম করা যাইতে পারে। তন্ত্রসার ও শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে গণেশবিমর্শিনী নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। উহার কোনো পুথি কোথায়ও আছে বলিয়া জানা যায় না— উহার পরিচয় অজ্ঞাত তবে নাম দেখিয়া উহাকে গণেশের উপাসনা বিষয়ক নিবন্ধগ্রন্থ বলিয়া মনে হয় গণেশ সম্পর্কে আর-একখানি নিবন্ধগ্রন্থের পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে উহার নাম মহাগণপতিক্রম, রচয়িতা অনন্তদেব।

নিবন্ধগ্রন্থ তন্ত্রসাহিত্যের এক বিরাট্ ও মূল্যবান্ অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। নানা সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের সাধক ও পণ্ডিতগণ তন্ত্রশাস্ত্রে অগণিত নিবন্ধ, টীকা-টিপ্পনী ও পদ্ধতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থরচনার ধারা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রধান প্রধান তান্ত্রিক নিবন্ধ ও নিবন্ধকারের পরিচয় 'তান্ত্রিক সাধক ও আচার্য' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য ও তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বুঝিবার ও জানিবার পক্ষে এইসব গ্রন্থ অপরিহার্য। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থে ব্যাপকভাবে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে— কোথাও কোথাও বা বিশেষ বিশেষ দেবতা ও তৎসম্পর্কিত অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও আলোচনা আছে। অতি অল্প পরিমাণ গ্রন্থে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে দেখা যায়। গ্রন্থকারদের নিজস্ব চিন্তা বা বিচারধারা ইহাদের মধ্যে বিশেষ নাই। ইহাদের মধ্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত গ্রন্থগুলির তালিকা আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে বিস্তীর্ণ তন্ত্রসাহিত্যে কোন্ গ্রন্থের কিরূপ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। যেসব গ্রন্থের উল্লেখ নিবন্ধগ্রন্থে নাই বা সামান্যভাবে আছে তাহাদের প্রতিষ্ঠা ছিল না বা খুব কম ছিল সন্দেহ নাই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে অধুনা সুপ্রসিদ্ধ মহানির্বাণতন্ত্রের প্রাচীন নিবন্ধগ্রন্থে অনুল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। মূল তন্ত্রের পুথি বা প্রকাশিত সংস্করণের প্রামাণ্য নিরূপণেও নিবন্ধগ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কোনো গ্রন্থ হইতে নিবন্ধে উদ্ধৃত অংশ যদি সেই

ন্থর কোনো পুথি বা সংস্করণে পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের প্রামাণিকতা ন্ধে কোনো সংশয় থাকে না— অন্যথা সংশয় স্বাভাবিক। অবশ্য নিবন্ধগ্রন্থের করনির্দেশও যে সকলক্ষেত্রে অভ্রান্ত এমন কথা বলা চলে না। প্রকৃত তথ্য য়ের জন্য চাই নিবন্ধ ও মূলগ্রন্থের পুথির পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনামূলক আলোচনা। ত-শাস্ত্রে এইরূপ আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে, তন্ত্র ও পুরাণ সম্পর্কে বিশেষ ছু হয় নাই।

তান্ত্রিক আচার্য ও সাধক

চীন কাল হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক তান্ত্রিক আচার্য ও সাধক গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকের রচিত সংস্কৃত ও ভাষাগ্রন্থ ইঁহাদের ত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। অনেক উচ্চাঙ্গের সাধক অবশ্য গ্রন্থ-না ও শাস্ত্র-প্রচারে সময়ক্ষেপ করা সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া ধ্যান-ধারণা দ্বারাই য় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রের ধার ধারিতেন না— স্ত্রজ্ঞান অর্জন করিবার মত, গ্রন্থ রচনা করিবার উপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি ইঁহাদের ছিল । তথাপি সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হইয়া ইঁহারা শিষ্য-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে য়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই রোধান-তিথিতে ইঁহাদের সাধনা-পীঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশ তে বহু শিষ্য সমবেত হইয়া গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

প্রথমশ্রেণীর সাধকদের মধ্যে শঙ্করাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য, লক্ষ্মণ শিক, ভাস্কররায় বা ভাসুরানন্দনাথ সর্ব-ভারতপ্রসিদ্ধ।

মায়াবাদ-প্রচারক প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য প্রপঞ্চসার নামক প্রসিদ্ধ ন্ত্রগ্রন্থ ও আনন্দ-লহরী নামক প্রসিদ্ধ দেবীস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ান্ত্রিক সমাজের ধারণা। লক্ষ্মণ দেশিকের জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছু জানা য় না। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহের নাম আচার্য পণ্ডিত ও পিতামহের নাম মহাবল। ইঁহারা সকলেই বড় বড় সাধক। লক্ষ্মণের রচিত ারদাতিলক সমগ্র ভারতের তান্ত্রিকসমাজে সমাদৃত। নানা দেশের পণ্ডিত-

মণ্ডলী বিভিন্ন সময়ে ইহার উপর নানা টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। তাঁহা রচিত অল্পপরিচিত আর-একখানি গ্রন্থের নাম তারাপ্রদীপ। ইহার বহু পুঁ নানা স্থান হইতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণ দেশিকের শারদাতিলকের পদার্থাদর্শ নামক বিস্তৃত টীকাগ্র মহারাষ্ট্রের রাঘব ভট্টের অতুলনীয় কীর্তি। ১৫৫০ বিক্রমাব্দে বা ১৪৯৪ খ্রীস্টাে এই টীকা রচিত হইয়াছিল। এই টীকা ছাড়া কালীতত্ত্ব নামক একখানি স্বত গ্রন্থও রাঘব ভট্ট রচনা করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোরের গম্ভীর রায়ের পুত্র ভাস্কররায় শ্রীবিদ্যার উপাস ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। অনেকগুলি গ্রন্থেব মধ্য দি তিনি শ্রীবিদ্যার গূঢ়রহস্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। তন্ত্রের মর্ম জানিতে হইে তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে সেতুবন্ধ, সৌভাগ্যভাস্কর ও বরিবস্যারহস্য অপরিহা ইহার বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্তের অনেক অংশ স্বর্গগত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূ কর্তৃক ১৮৪৪ ও ৪৫ সালের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণানন্দ

বাংলার যেসমস্ত সাধক-পণ্ডিত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ বিবৃত করিয়া এ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ এই তিনজ সমধিক প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যতগুলি তন্ত্রনিবন্ধ রচিত হইয়াে তাহাদের সকলগুলির মধ্যে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃ বাংলার যেসমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায় গুরুগিরি, তাঁহাদের প্রায় সকলে ঘরেই এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড পুঁথি বা মুদ্রিত সংস্করণ আজ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই সম্পাদি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মানন্দ

পূর্ণানন্দের গুরু ব্রহ্মানন্দগিরি আনুমানিক খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ব মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ত্রিপুবানন্দের শিষ্য ছিলেন তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীে

অষ্টাদশ উল্লাসে শাক্তদিগের আচার-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ তারারহস্য চার পটলে সমাপ্ত। ইহাতে তারার উপাসনার আনুষঙ্গিক আচারাদি আলোচিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ণানন্দ

ব্রহ্মানন্দের উপযুক্ত শিষ্য পূর্ণানন্দ পরমহংসের সময় তাঁহার নিজ রচিত গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁহার শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে) ও শাক্তক্রম ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে) রচিত হইয়াছিল। পূর্ণানন্দ ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার কাটিহালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সাধনবলে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু পরিবার তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন। তাঁহার বংশীয়গণ আজ পর্যন্ত অনেক স্থলে সেই গৌরবময় পদ অধিকার করিয়া সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্যামারহস্যে কালীর উপাসকের আচার-অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে; শাক্তক্রমে সাত উল্লাস বা অধ্যায়ে শাক্তের আচার অনুষ্ঠান ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি নামক বিস্তৃত গ্রন্থে শ্রীবিদ্যার উপাসনা ও প্রাসঙ্গিক আচারাদি বিশদভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তাঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থের নাম তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী ও ষট্‌কর্মোল্লাস।

গৌড়ীয় শঙ্কর

এই প্রসঙ্গে আর একজন গ্রন্থকারের কথা বলা যাইতে পারে। তিনি সাধারণতঃ গৌড়ীয় শঙ্কর বা বাংলাদেশের শঙ্করাচার্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মনে হয় শঙ্কর আগমাচার্য। গৌড় বা বাংলাদেশেই তাঁহার বাড়ি ছিল। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর এবং পিতামহের নাম লম্বোদর। ৫১১ লক্ষ্মণ সংবতে (১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে) লিখিত তাঁহার তারারহস্যবৃত্তিকার এক পুথি নেপাল দরবার লাইব্রেরিতে আছে। এই গ্রন্থে তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী রচয়িতা

প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও অনেকে তন্ত্রোক্ত দেবতার মাহাত্ম্য ও

তান্ত্রিক উপাসনার রহস্য প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার মঙ্গলকাব্য ও শাক্তসঙ্গীত রচয়িতারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিব কৃষ্ণ দুর্গা চণ্ডী মনসা কালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শত শত বাঙালি কবি মধ্যযুগে বাংলা মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের রচিত চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল ও কালিকামঙ্গল আজ পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে গীত হইয়া থাকে। এইসকল কাব্য বাংলার জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে।

বিস্তৃত কাব্য ব্যতীত বৈষ্ণব পদাবলী ও তাহার আদর্শে বহু শাক্ত-সঙ্গীতও বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় শাক্তসঙ্গীতগুলিও গভীর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে বাৎসল্যরসের যে বিস্তার দেখা যায়, তাহা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দুর্লভ। ইহাদের আন্তরিকতা ও স্বচ্ছসারল্য অহিন্দুরও হৃদয় আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতে রচিত স্তোত্রে দেবতার মহত্ত্বের বিবরণ ও ভক্তিভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু আলোচ্য সঙ্গীতগুলিতে দেবতার নিকট যে আবদারের ভাব দেখানো হইয়াছে, সংসারের অশেষ ক্লেশের জন্য, কঠোর পরীক্ষার জন্য দেবতাকে যে মৃদু তিরস্কার করা হইয়াছে তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বস্তুত এইসব সঙ্গীতের কবি ও যে-সব সাধকের কথা কিছু পরেই বলা হইবে তাঁহারা শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিকে তত বেশি লক্ষ্য করিতেন না, দেবতার ধ্যান-ধারণা ও নামকীর্তনই ছিল তাঁহাদের সাধনার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য সাধনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াও কিছু কিছু শাক্তসঙ্গীত রচিত হইয়াছে।

শাক্ত-সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে সাধক রামপ্রসাদই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সঙ্গীত বাংলার জনসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত। বঙ্গপল্লীর অসংখ্য নরনারী রামপ্রসাদী সঙ্গীতসুধা পান করিয়া সংসারের দুঃখজ্বালার মধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করে এবং জগজ্জননীর চরণোপান্তে ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হয়। রামপ্রসাদের পরেই অম্বিক

চালনার কমলাকান্তের নাম করা যাইতে পারে। তিনি প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া বহু সঙ্গীত ও সাধকরঞ্জন নামে তান্ত্রিকযোগ-প্রতিপাদক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এইরূপ আরও বহু শাক্ত কবির নাম করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব কবি ও কবিতার যেরূপ আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, সেরূপ আলোচনা শাক্ত কবি ও কবিতা সম্বন্ধে না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ইঁহারা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সাহিত্য ও ধর্মের ইতিহাসে ইঁহাদের স্থান উপেক্ষণীয় নহে।

বিভিন্ন প্রদেশের তান্ত্রিক আচার্য

অন্যান্য প্রদেশের অগণিত সাধক পণ্ডিতদের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত সর্বভারত-প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ছাড়া মহারাষ্ট্রের শৈব নীলকণ্ঠ, দাক্ষিণাত্যের শ্রীনিবাস ভট্ট গোস্বামী ও তাঁহার বংশধরগণ, কাশীর কাশীনাথ ভট্ট, কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত ও সাহিব কৌল এবং নেপালের নবমীসিংহের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের পরিচয় দেওয়ার পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থের নামমাত্র উল্লেখ করিব। যথা, নেপালের মহারাজ প্রতাপসিংহ-কৃত বিশাল গ্রন্থ পুরশ্চর্যার্ণব, বোম্বাই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্মার্ত কমলাকর-কৃত মন্ত্রকমলাকর ও শান্তিকমলাকর, অহিচ্ছত্রের মহীধর-কৃত মন্ত্রমহোদধি, মিথিলার নরসিংহ ঠক্কুর-কৃত তারাভক্তিসুধার্ণব, উড়িষ্যার লক্ষ্মীধর-কৃত শৈবকল্পদ্রুম, দামোদর সুরি কৃত তন্ত্রচিন্তামণি ও যন্ত্রচিন্তামণি, বাঘেল বংশের রাজকুমার জেত্রসিংহ-কৃত ভৈরবার্চাপারিজাত, বুন্দেল বংশের রাজা দেবীসিংহের অনুরোধে তাঁহার গুরুপুত্র শিবানন্দ গোস্বামী রচিত সিংহসিদ্ধান্তসিন্ধু, শ্রীচক্রের আদর্শে নির্মিত শ্রীবিদ্যানগরের রাজা লক্ষ্মণ দেশিকের বিরোধী প্রৌঢ়দেবের পুত্রের অনুরোধে প্রগল্‌ভাচার্যের শিষ্য কর্তৃক রচিত বিদ্যার্ণবতন্ত্র, রেওয়ার মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ-কৃত মন্ত্রার্থনির্ণয় প্রভৃতি।

শৈব নীলকণ্ঠ

মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্ধুরী পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক শৈব নীলকণ্ঠ পণ্ডিতসমাজে তাদৃশ সুপরিচিত না হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ও গ্রন্থকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত একাধিক গ্রন্থ আজি তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, প্রাচী ভারতের অন্যান্য অনেক মনীষীর মত শৈব নীলকণ্ঠেরও বিস্তৃত পরিচ জানিবার উপায় নাই। তাঁহার উপলভ্যমান গ্রন্থগুলির মধ্যে যে পরিচ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি এক শৈব বংশে জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের প্রপিতামহ ময়ূরেশ্বরের সময় হইতেই বংশের নূত পদবী হয়— শৈব। নীলকণ্ঠের পিতামহের নামও নীলকণ্ঠ। পিতার না রঙ্গনাথ ও মাতার নাম লক্ষ্মী। নীলকণ্ঠ তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের পুষ্পিকায় প্রারম্ভে ও অবসানে পিতামাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দু গুরু কাশীনাথ ও শ্রীধর, এবং রত্নজী নামক এক পৃষ্ঠপোষকেরও না উল্লেখ করিয়াছেন। এই রত্নজীর অনুরোধেই তিনি দেবীভাগবতের টীকা রচন করিয়াছিলেন। মনে হয়, নীলকণ্ঠ মহারাষ্ট্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মারাঠী ভাষার কয়েকটি শব্দ তিনি এই টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন (৮।২৪।২৫—৭)

নীলকণ্ঠ তাঁহার কোনো গ্রন্থেরই রচনার সময় নির্দেশ করেন নাই। তবে তি তাঁহার গ্রন্থে যেসকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহা আবির্ভাবকাল মোটামুটি অনুমান করা যাইতে পারে। দেবীভাগবতের টীকা নীলকণ্ঠ কর্তৃক যেসকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদে মধ্যে ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত মহীধর-কৃত মন্ত্রমহোদধি, ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে রচি ভাস্কররায়-কৃত গুপ্তবতী ও ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর নাগোজী ভট্টের নাম ক যাইতে পারে। ইহা হইতে মনে হয় যে নীলকণ্ঠ খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূ আবির্ভূত হন নাই।

নীলকণ্ঠের গ্রন্থগুলির মধ্যে দেবীভাগবতটীকাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষ অর্বাচীন; কারণ, ইহাতে প্রায় অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থই উল্লিখিত হইয়াছে। এ টীকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য সঠিক ভা নির্ণয় করা এখন পর্যন্ত সম্ভবপর নহে।

এই টীকায় প্রসঙ্গত শক্তি-উপাসনার রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মতে বী ব্রহ্মস্বরূপা— সর্ববেদান্ততাৎপর্যভূমি। দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী— জীবদশার শই এই বিদ্যার লক্ষ্য। তাই দেবীর সম্মুখে পশুবলির ব্যবস্থা। নীলকণ্ঠের :ত ইহাই হইল পশুবলির তাৎপর্য (দেবীভাগবতটীকা— ৩।২৬।৩৩)। শৈব ংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থে সৃষ্টিক্রম বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ 'খিতে পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠের মতে তাহার কারণ সৃষ্টির মিথ্যাত্ব এবং দ্রজালবৎ দৃশ্যমান এই জগতের উৎপত্তিবর্ণনা কেবল মূঢ় জনের যথাকথঞ্চিৎ :প্তিবিধানের নিমিত্ত (দেবীভাগবতটীকা— ৩।৭।৩৮)। নীলকণ্ঠ শৈব, শাক্ত, ।ার, গাণেশ, বৈষ্ণব ও নাস্তিক মতের প্রতিপাদক ছয়টি দর্শনের উল্লেখ রিয়াছেন। শাক্ত দর্শনের মতে ভুবনেশ্বরীর দশ বা নয় তত্ত্ব। সর্বপ্রপঞ্চের হাতে অন্তর্ভাব তাহাই তত্ত্ব (দেবীভাগবতটীকা— ৪।১৫।১২)।

নীলকণ্ঠের ধারণা ছিল তিনিই দেবীভাগবতের প্রথম টীকাকার। প্রতি ন্ধের শেষে তিনি এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ক্যাটালোগাস ্যাটালোগোরাম নামক গ্রন্থসূচীতে ইহার আরও দুইখানি টীকার উল্লেখ ।খিতে পাওয়া যায় (১।২৬১)। তবে দুঃখের বিষয়, তাহাদের রচনাকাল ও ন্যান্য বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রীনিবাস ভট্ট

শ্রীনিবাস ভট্ট গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত ও আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক শীতে আসিয়া বসবাস করেন। শ্রীনিবাসের আদিবাড়ি কাঞ্চীনগরের দক্ষিণে ।নদীর তীরে অনন্ত নামক গণ্ডগ্রামে। কোনো এক রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা শ্রীনিবাসেরই পূর্বপুরুষ কি না তাহা জানা ৷ না। তবে এই গ্রামে শ্রীনিবাসের প্রপিতামহ আত্রেয় গোত্রের গৌরব-স্বরূপ রপুঙ্গব দীক্ষিত বাস করিতেন। শ্রীনিবাসের পিতামহ তিমুম্মল দীক্ষিত কজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্যাকরণে পতঞ্জলিসদৃশ, মীমাংসায় ভাকরতুল্য ও বেদে ব্রহ্মার সমকক্ষ ছিলেন। শ্রীনিবাসের পিতা শ্রীনিকেতন কজন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ— বৈদিকক্রিয়াকলাপে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল।

অগাধ পণ্ডিত শ্রীনিবাস এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ প্রবী লাভ করেন। একবার কোনো তান্ত্রিক উৎসব উপলক্ষে তিনি প্রসিদ্ধ শক্তি জালন্ধরে গমন করেন। এইখানে তিনি সুন্দরাচার্য বা সচ্চিদানন্দনাথ না তান্ত্রিক আচার্যের নিকট দীক্ষালাভ করেন। এই সচ্চিদানন্দই বোধ ললিতার্চনচন্দ্রিকা, লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি তান্ত্রিক নিবন্ধের রচয়িতা। দীক্ষাগ্রহ পর শ্রীনিবাসের নাম হয় বিত্যানন্দনাথ। গুরুর আদেশ-ক্রমে বিত্যানন্দ কাশীব হন। এখানে ইনি অনেক ছাত্রের অধ্যাপনা করেন এবং কালক্রমে স উত্তর-ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন।[২৬]

ইনি কয়েকখানি তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চারিখা উল্লেখ ইঁহার রচিত শিবার্চনচন্দ্রিকার শেষে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে : তিনখানির পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ভৈরবার্চনচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের কো পুঁথি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে নাম দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা ইহাতে শৈব উপাসনার বিধিব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার সৌভাগ্যরত্না ছত্রিশ পটলে ত্রিপুরার উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। বিকানীর, মাদ্রাজ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার পুঁথি আছে। প্রতি পটলের শে গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে বিত্যানন্দনাথ এই নাম পাওয়া যায়। বিত্যানন্দনাথ শ্রীনিবাসেরই নামান্তর তাহা গ্রন্থের উপসংহারে একটি শ্লোক হইতে জানা যা পিটারসন সাহেব কিন্তু বিত্যানন্দ ও শ্রীনিবাসকে বিভিন্ন ব্যক্তি মনে করিয়াছে তিনি বিত্যানন্দকে শ্রীনিবাসের সহাধ্যায়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সপর্যাক্রমকল্পবল্লী গ্রন্থে পাঁচ স্তবকে শ্রীনিবাস চণ্ডিকার উপাসনাপদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। মাদ্রাজে ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ই পুঁথি আছে। শ্রীনিবাস-রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বোধ শিবার্চনচন্দ্রিকা। ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ, ইহাতে ব্যাপকভাবে তান্ত্রিক উপাস পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঁচ খণ্ডে ও ছেচল্লিশ পটলে বিভক্ত। ইহা

২৬ শ্রীনিবাসের দুই পৌত্র শিবানন্দ ও জনার্দন স্বরচিত সিংহসিদ্ধান্তসিন্ধু ও মন্ত্রচন্দ্রিকা : পিতামহের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

াব, শক্তি, গণেশ, বিষ্ণু ও সূর্য এই পঞ্চদেবতার উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। লিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, পুণার ভাণ্ডারকার ইন্‌স্টিটিউট, কাশীর ংস্কৃত কলেজ ও বিকানীরের দরবার লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের পুথি আছে। ই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শ্রীনিবাসের পৌত্র জনার্দন মন্ত্রচন্দ্রিকা নামে একখানি াপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের আবার ইটি সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় সংস্করণ দ্বাদশ পটলে সম্পূর্ণ। লিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও পুণার ভাণ্ডারকার ইন্‌স্টিটিউটে এই ংস্করণের পুথি আছে। নয় পটলে সম্পূর্ণ ছোট সংস্করণের একখানি পুথির র্ণনা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দিয়াছেন।

শিবার্চনচন্দ্রিকায় শ্রীনিবাস স্বরচিত সকল গ্রন্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন কি না না যায় না। এইরূপ অনুল্লিখিত গ্রন্থের মধ্যে সৌভাগ্যসুভগোদয় নামক ন্থের একখানি পুথির উল্লেখ পিটারসন সাহেব করিয়াছেন। আউফ্রেক্‌ট াহার ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরম গ্রন্থে শ্রীনিবাস-রচিত বলিয়া আর য়েকখানি গ্রন্থের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। সত্য বটে, এই গ্রন্থগুলিরও চয়িতার নাম শ্রীনিবাস, ইহাদের বিষয়বস্তুও শ্রীনিবাসের রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর স্বরূপ তান্ত্রিক উপাসনার পদ্ধতি-নিরূপণ। তবে ইহাদের পুথি উত্তর-পশ্চিম-ামান্তেই পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহাদের রচয়িতা ঐ প্রান্তের লোক। আমাদের ানিবাসের সহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

শ্রীনিবাসের পরে শ্রীনিবাসের বংশধরগণ বংশের গৌরব কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেন ই— অনেক অংশে বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জগন্নিবাসের শিষ্যদের ধ্যে অনেক রাজারাজড়া ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বুন্দেলবংশীয় দেবীসিংহের ম জগন্নিবাসের অন্যতম পুত্র শিবানন্দ গোস্বামী কর্তৃক রচিত সিংহসিদ্ধান্তসিন্ধু মক তান্ত্রিক নিবন্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

কাশীনাথ ভট্ট ভড়

কাশীনাথ ভট্ট ভড় বা শিবানন্দনাথের রচিত বহু তান্ত্রিক ও পৌরাণিক বন্ধাদির পুথি উত্তর-ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়। মনে হয়, এক যুগে

এই গ্রন্থকারের দিগন্তবিস্তৃত খ্যাতি ছিল। কালের কুটিল নিয়মে আজ তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত। ইঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ও পুষ্পিকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইঁহার পিতার নাম জয়রাম ভট্ট ভড়, মাতার নাম বারাণসী, পিতামহের নাম শিবরাম এবং মাতামহের নাম অনন্ত। ইঁহার পিতা ও মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার বাসভূমি ছিল কাশীধাম। খুব সম্ভব খ্রীস্টীয় সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল।

কাশীনাথ ছিলেন শৈব-শাক্ত। তিনি দক্ষিণাচারের অনুসরণ করিতেন। তিনি নিজেকে 'দক্ষিণাচারমতপ্রবর্তক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বামাচারের বীভৎস আচারের প্রাবল্য দেখিয়াই বোধ হয় তিনি বামাচার-মতের খণ্ডন করিয়া দক্ষিণাচারকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। কাশীরামের পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁহার অর্ধশতাধিক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, তাঁহার গ্রন্থশেষে উল্লিখিত কয়েকটি উপাধিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। এইসকল উপাধির মধ্যে মন্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ, শ্রুতিস্মৃতি-মতপ্রমাণপারাবার-পারীণ, সর্বতন্ত্রদক্ষিণাচারতন্ত্রধুরীণ এই কয়টি উল্লেখযোগ্য।

বিষয় হিসাবে কাশীনাথের গ্রন্থগুলিকে মোটামুটি এইরূপ ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে— তন্ত্রটীকা, তন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ গ্রন্থ, তন্ত্রের প্রামাণ্য-নির্দেশাত্মক গ্রন্থ, তন্ত্রের বিভিন্ন আচার (দক্ষিণাচার, বামাচার, কাপালিক মত) ও কৃত্য (পুরশ্চরণাদি) সম্বন্ধে গ্রন্থ, স্মৃতি ও পুরাণ বিষয়ক গ্রন্থ, বিভিন্ন দেবতা পূজাপদ্ধতি ও গৌরব-প্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ বে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল বুঝা যায়। তাই তাহাদের অনেকগুলির একাধি পুথি বা সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। তাঁহার দুর্জন-মুখ-চপেটি ফরাসি ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাঁহার 'বামাচার-মতখণ্ডন' গ্রন্থের প্রতিব হিসাবে গোদাবরীতীর-বাসী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক রচিত 'বামাচার-সিদ্ধান্ত-সংগ্র তাঁহার গ্রন্থের গুরুত্বের পরিচয় প্রদান করে।

অভিনবগুপ্ত

কাশ্মীরের বহুসংখ্যক সাধক পণ্ডিতদের মধ্যে অভিনবগুপ্তের নাম বিশে

ব উল্লেখযোগ্য। ইনি খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া নকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ালোক নামক বিশাল গ্রন্থ। অভিনবগুপ্ত কুলমত অনুসরণ করিয়া শাস্তি ও প্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অনুমান হয়, এইজন্যই তিনি কৌলিক শম্ভুনাথকে অধিকতর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই গুরুর নিকট হইতে ৌলশাস্ত্র ও সাধনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অভিনবগুপ্ত জলন্ধরে গমন রিয়াছিলেন। অভিনবগুপ্ত এবং তাঁহার গুরু ও শিষ্যপরম্পরার প্রযত্নে শ্মীরের বিখ্যাত শৈবসাহিত্য গড়িয়া ওঠে।

সাহিব্ কৌল

সাহিব্ কৌল কাশ্মীরের কোনো পদ বা উপাধিবিশেষের নাম বলিয়া মনে । পদবী হিসাবে কৌল শব্দ কাশ্মীরে অপরিচিত নহে। কৌলবংশের মধ্যে ষ্ঠ ব্যক্তিকে সাহিব্ কৌল এই উপাধিতে ভূষিত করা হইত কি না সঠিকভাবে লতে পারা যায় না। একাধিক তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে এই পাধিধারী ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমূহের নাম পাওয়া যায়। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ তাব্দীতে এই উপাধিধারী এক ব্যক্তি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া না যায়। তাহাদের মধ্যে একখানির পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির থিশালায় আছে। এই গ্রন্থের নাম দেবীনামবিলাস। ইহা ১৭২৩ সংবৎ বা ৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থকার গর্বের সহিত একাধিক ক্ষেত্রে তাঁহার উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন। ক দেবীনামবিলাসগ্রন্থেই তিন স্থলে এই গৌরবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কানো এক সাহিব্ কৌলের রচিত শ্রীবিদ্যানিত্যপূজাপদ্ধতি নামক অপর একখানি ন্থের উপসংহারশ্লোকেও এই পদ বা উপাধির গৌরবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খ্রীস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতেও সাহিব্ কৌল উপাধিধারী ব্যক্তির সন্ধান াওয়া যায়। জ্যোতিঃপ্রকাশ ও চিদ্রূপ নামক দুই শিষ্য স্বীয় গুরু সাহিব্ ৌলের স্তব রচনা করেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের শিষ্য গোবিন্দ ১৮৩০ শকাব্দ ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিঃপ্রকাশ রচিত স্তবের টীকা প্রণয়ন করেন।

নিম্ননির্দিষ্ট কয়েকখানি গ্রন্থের পুথিতেও রচয়িতা হিসাবে সাহিব্ কৌ নাম পাওয়া যায়। এইসকল পুথিতে গ্রন্থকারকে মহামাহেশ্বরাচার্য সাহি কৌলানন্দনাথ বা মহামাহেশ্বরাচার্য সাহিব্ কৌল রূপে নির্দেশ করা হইয়া দেবীনামবিলাসরচয়িতার সহিত এইসকল গ্রন্থের রচয়িতার সম্পর্ক নিরূপণ এখ সম্ভবপর নহে :

১। শ্রীবিদ্যানিত্যপূজাপদ্ধতি ॥ ত্রিপুরার পূজা-বিষয়ক বিস্তৃত নিবন্ধগ্রন্থ

২। সারিকাস্তব ॥ সারিকাদেবীর ক্ষুদ্র স্তোত্র।

৩। শ্লোকসমষ্টি

নবমী সিংহ প্রভৃতি

নেপালাধিপতি ভূপালেন্দ্র মল্লের (রাজ্যকাল ১৬৮৯-১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ) অমা নবমী সিংহ বা আত্মানন্দন রচিত দুইখানি বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধ গ্রন্থের পুথি: পা গিয়াছে। গ্রন্থ দুইখানির নাম তন্ত্রচিন্তামণি ও কুলমুক্তিকল্লোলিনী। নেপা রুক্ম নামক পার্বত্য প্রদেশের অধীশ্বর মলৈবম্মদেবের আশ্রয়-পুষ্ট কূর্মাচলাধিবা প্রেমনিধিপন্থের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা প্রেমনিধি স্বীয় শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক মলৈবম্ম কর্তৃক নানাভা সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে প্রেমনিধি কাশীতে প্রচুর সম্পত্তি একখানি গৃহ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিদানে গুরু শিষ্যের এক বিচিত্র প্রশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিবতাণ্ডবের যন্ত্রপ্রকরণের টীকায় এক একটি য বিবরণের পর ৮৪ শ্লোকে সমাপ্ত এই প্রশস্তির এক-একটি শ্লোক সন্নিবেশি হইয়াছে।

সাধনায় প্রসিদ্ধ সাধক

যাঁহাদের রচনার পরিচয় উপরে দেওয়া হইল তাঁহাদের অনেকেরই সাধনা উৎকর্ষ সম্বন্ধে নানা বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। সাধনার বলে ইহা অনেকেই অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ বিভূতি অর্জন করিয়াছিলেন। দৈ অনুপ্রেরণার বশে দেবতার সন্তোষসাধনের জন্যই ইঁহাদের অনেকে গ্রন্থরচ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এরূপ বলা হয়। তাই ইঁহাদিগকে শুধু পণ্ডিত ও গ্রন্থ

লিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ ইঁহারাও উচ্চাঙ্গের সাধক এবং ন্থাদি রচনা ইঁহাদের সাধনার অঙ্গ মাত্র। কিন্তু সাধনা অপেক্ষা ইঁহাদের চিত গ্রন্থাদিই ইঁহাদিগকে প্রসিদ্ধ ও অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সাধনাই যাঁহাদের প্রসিদ্ধির কারণ এইবার সেইরূপ কয়েকজন শক্তি-পাসকের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইরূপ বহু সাধক নানা সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাদের স্থানীয় প্রতিপত্তির ভাব ছিল না। তবে নিজ নিজ প্রদেশের বাহিরে ইঁহারা তেমন পরিচিত ন। ইঁহাদের বিবরণ একত্র সংকলিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। পূর্বভারতের াক্ত সাধকদের মধ্যে মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়, দেবাদিত্য ও র্ধমান প্রভৃতি এবং বাংলাদেশের সর্বানন্দ, অর্ধকালী, গোঁসাই ভট্টাচার্য, ামাক্ষেপা ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে মকৃষ্ণ পরমহংসের নাম জগৎপ্রসিদ্ধ— বাংলার অপর কয়জন সারা বাংলাদেশে থবা তাহার অংশবিশেষে সুপরিচিত।

সর্বানন্দ

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে সর্বানন্দ ঠাকুরের াবির্ভাব হয়। তিনি বাল্যকালে অতি জড়-প্রকৃতি ছিলেন, নির্বোধ বলিয়া াহার দুর্নাম ছিল। কোনো রূপ লেখাপড়া শিক্ষা করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া ঠে নাই। তাঁহার পিতামহ বাসুদেবের দেশব্যাপী প্রতিপত্তি পৌত্রের মূঢ়তায় ন্ন হইবে অনেকের এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল। মূর্খ সর্বানন্দ একদিন মেহারের াজসভায় অমাবস্যা-তিথিকে পূর্ণিমা বলিয়া বিশেষ অপদস্থ হইয়াছিলেন। াজের মূর্খতার জন্য তাঁহার মনে ধিক্কার উপস্থিত হয়। এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে াশ্বস্ত করিয়া মন্ত্রদান করেন। অমাবস্যার গভীর রাত্রে শবরূপী ভৃত্য পূর্ণানন্দের াহের উপর উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র জপের দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। াবী তাঁহার দশমহাবিদ্যা রূপ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ফলে, াতঃপর তিনি সর্ববিদ্যা নামে অভিহিত হইতে থাকেন। সর্ববিদ্যার বংশধরগণ াজ পর্যন্ত সমাজে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। বাংলার

বহু স্থানে ইঁহাদের শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বানন্দের অযত্নরক্ষি সিদ্ধিক্ষেত্র মেহারের কালীবাড়িতে প্রতি বর্ষে পৌষ মাসের সংক্রান্তির দি এখনও এক বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এইখানেই পূর্বে মাতঙ্গ নামক মুনি আশ্রম ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সর্বানন্দে সিদ্ধিলাভের পর হইতেই ইহার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মেহার এখন বাংলা একটি তীর্থস্থান। নানা স্থান হইতে ভক্তগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

সর্বানন্দের পুত্র শিবনাথ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় 'সর্বানন্দতরঙ্গিণী' না তাঁহার এক জীবনচরিত রচিত হইয়াছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া শ্রীযু অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নিশিকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় সরল বাংলা ভাষ সর্বানন্দের দুইখানি শিশুপাঠ্য জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদ প্রভৃতি মহাপুরুষের মূর্খতা বিষয়ক প্রবাদের মত সর্বানন্দের মূর্খতা বিষয়ক প্রবাদ অমূলক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার দেবীস্তব সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 'সর্বোল্লাস' নামে সর্বানন্দ রচিত যে তান্ত্রিক নিবন্ধ-এ পাওয়া যায় তাহা এই সর্বানন্দের রচনা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকে না।

অর্ধকালী

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার সমীপবর্তী পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে প্র তিন শত বৎসর পূর্বে দ্বিজদেব নামক এক সাধকপ্রবরের গৃহে জয়দুর্গা নামে এ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। স্বয়ং পরমেশ্বরীই দ্বিজদেবের সাধনায় তুষ্ট হইয়া এ কন্যারূপে দ্বিজদেবের জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ এইরূপ প্রবাদ আছে। ইঁহার দেহের অর্ধাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধাংশ গৌরবর্ণ তাই ইনি অর্ধকালী এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জে অধীন মিতরা গ্রামের রাঘবরাম নামক দ্বিজদেবেব ছাত্রের সহিত ইঁহার বিব হয়। পাকস্পর্শের দিন অর্ধকালী অন্নপাত্র-হস্তে সভামধ্যে পরিবেশনের জ উপস্থিত হইলে সহসা বাতাসে তাঁহার মাথার ঘোমটা খুলিয়া যায়। তখন দে যায়, ইনি যে দুই হাতে থালা ধরিয়াছিলেন তাহা ছাড়া আর দুইখানি হা

ীয়া ঘোমটা ঠিক করিতেছেন। তাঁহার এই চতুর্ভুজমূর্তি-দর্শনে সমবেত সকলেরই ঢ় প্রতীতি হয় যে, তিনি দেবী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। অর্ধকালীর স্বামী াঘবরাম খুব উঁচুদরের পণ্ডিত না হইলেও একজন মস্ত বড় সাধক ছলেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। সহাধ্যায়ীরা ৭কবার মাছ ধরিতে গেলে তিনি অক্লান্তভাবে দীর্ঘকাল জলের মধ্যে বাঁধের াত পড়িয়াছিলেন। এই অসাধারণ শক্তি সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। তাঁহার ানিষ্ঠ পুত্র একবার তাঁহার চণ্ডীপাঠে ভুল ধরিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ংশে চণ্ডীপাঠ নিষেধ করিয়া যান। আজ পর্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ দুর্গাপূজায় ণ্ডীপাঠ করেন না। অর্ধকালী ও রাঘবরাম দেবতা রূপে তাঁহাদের বংশের লাকের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। অর্ধকালীর পিতৃ-বংশ ও শ্বশুর-বংশ মাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বরূপ-কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ 'রাঘবদীপিকা' ও শ্রীযুক্ত াতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কৃত 'অর্ধকালী' নামক সরল বাংলা গ্রন্থে ইঁহার জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে।

গোঁসাই ভট্টাচার্য

গোঁসাই ভট্টাচার্য নামে সুপরিচিত রত্নগর্ভ নামক সাধক বাংলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চাঁদ ও কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। ঢাকার অন্তর্গত মায়েসারের িগম্বরীতলায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোঁসাই ভট্টাচার্য বীরাচার অবলম্বনে সাধনা করিয়া অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধের সময় াহার পূজার আন্তরিকতায় মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল— তরবারি ারা দেবতার বিগ্রহে আঘাত করিলে তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছিল াইরূপ প্রবাদ আছে। তাঁহার নির্মিত দুইখানি দেবী-যন্ত্র বা দেবীপ্রতীক আজ র্যন্ত তাঁহার বংশধরগণের গৃহে রহিয়াছে। ইঁহারাও সমাজে বেশ সম্মান ও প্রতিপত্তি পাইয়া থাকেন।

বামাক্ষেপা

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের অনতিদূরবর্তী আটলা

গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে বামাচরণের জন্ম হয়। তিনি আবাল্য বিমনা ও জড়-প্রকৃতি ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার এই বিকৃত ভাবের জন্যই তিনি বামাক্ষেপা নামে পরিচিত। অল্পবয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তারাপীঠের মহাশ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে প্রাচীনকাল হইতে অনেক মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনপ্রবাদ বশিষ্ঠ ঋষির সাধনাকেও এই স্থানের সহিত সংযুক্ত করে এবং এই স্থানকে তাঁহার সিদ্ধিক্ষেত্র রূপে নির্দেশ করিয়া থাকে। নাটোরের সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বামাচরণ তারা-চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন— তারাভক্তি তাঁহার স্বভাবগত ছিল। তিনি অনবরত তারানাম কীর্তন করিতেন। নিয়মিত পূজা তিনি করিতে পারিতেন না— পূজা করিতে বসিলেই তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তিনি আপনভোলা পাগলের মত শ্মশানে কাটাইলেও বহু লোক তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে সমবেত হইত। বিগত ১৩১৮ সালে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তারাপীঠ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রতি বৎসর এখানে মেলা হয় এবং মহাসমারোহে দেবীর পূজা হয়। যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্তৃক বাংলা ভাষায় ইঁহার কয়েকখানি জীবনচরিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। বিভিন্ন ভাষায় তাহার জীবনচরিত ও উপদেশাবলী প্রচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণী নাম্নী এক ব্রাহ্মণী ভৈরবীর নিকট তিনি দীক্ষিত হন এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নানা তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি আজ সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট পবিত্র স্থান রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। তাঁহার সরল গভীর তথ্যপূর্ণ উপদেশাবলী সহস্র সহস্র নরনারীর চিত্তের উন্নতিবিধান করিতেছে। শাক্ত সাধকগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই স্মৃতি সুরক্ষিত হইয়াছে।

পল্লীতে পল্লীতে বিভিন্ন দেবস্থানে এইরূপ কত সাধকের স্মৃতি বিজড়িত আছে
। জনে তাহার খোঁজ রাখে ? অথচ দেশের ধর্মের ইতিহাসে ইঁহাদের স্থান নগণ্য
হ্— দেশের ধর্মের ক্রমপরিণতির ইতিহাস লিখিতে হইলে ইঁহাদিগকে উপেক্ষা
া চলিবে না। তাই, বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অবিলম্বে ইঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ
রিয়া প্রকাশ করা দরকার। দিন দিন লোকে ইঁহাদের কথা ভুলিয়া যাইতেছে
· তাই কালক্ষেপ করিলে হতাশ হইতে হইবে। অবশ্য লোকের মুখে শোনা
বরণ ও গালগল্প সর্বথা নির্ভরযোগ্য নহে ; কিন্তু এ-স্থলে তাহারই মধ্য হইতে
তিহাসিক তথ্যের ক্ষীণ সূত্র আবিষ্কার করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এইরূপে
়াদের জীবনী সংগৃহীত হইলে শাক্ত-ধর্ম ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধেও প্রকৃত তথ্য
র্য় করা সম্ভবপর হইবে। ইঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে
ক্ত-ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে বিরুদ্ধ ধারণা আছে তাহা অপসৃত হইবে।
ক্ত-ধর্ম ও উহার আদর্শকে অনেক পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করিয়াছেন। এই-
: মহাপুরুষের ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অনুশীলন করিলে তাঁহাদের
চবাদের অসারতা স্বতই প্রতিপন্ন হইবে। তাই দেশের লোকের কর্তব্য এইসব
াপুরুষের স্মৃতি চির-জাগরূক রাখার ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই
, দেশের লোকের দৃষ্টির অভাবে ইঁহাদের অনেকেরই বাস্তুভিটা ও সিদ্ধিক্ষেত্র
জ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় মানুষের ব্যাবহারের অনুপযোগী হইয়া রহিয়াছে।
সরের মধ্যে কয়েক দিনের জন্য হয়তো কোথাও কোথাও বার্ষিক মেলা প্রভৃতি
পলক্ষে কিছু লোকসমাগম হয়, অথবা কালে-ভদ্রে দুই-চারিজন ভক্ত সেইসব
ন পরিদর্শন করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন।

তান্ত্রিক দেবতা ও পূজাপদ্ধতি

ন্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের উপাস্য প্রধান প্রধান দেবতার কথা উল্লেখ
রা হইয়াছে। একই দেবতার নানা রূপ ও অবান্তর ভেদের কথা বলা
। নাই। এইখানে সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাইতেছে। তন্ত্রে একই
বতার ও তাহার বিভিন্ন রূপের উপাসনায় অল্পবিস্তর বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ

করিবার ব্যবস্থা আছে। রাম কৃষ্ণ শিব কালী প্রভৃতি দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র, ধা ও উপাসনাপদ্ধতি তন্ত্রগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার বৈষ্ণব দেবতা হিসা বিষ্ণু বা নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, বাসুদেব, বালগোপাল, দধিবামন, লক্ষ্মীনারায় নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি; শৈব দেবতা হিসাবে শিব, মৃত্যুঞ্জয়, বটুকভৈর ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি; শাক্ত দেবতা হিসাবে কালী, তারা, ভৈরবী প্রভৃতি ব দেবতার নাম ও পূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্তদেবতার সংখ্যা বৈচিত্র্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শাক্তের প্রধান উপাস্য দেবতা দশ মহাবিদ্যা। কালী, তারা, ষোড়শী (ত্রিপু সুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা), ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাত ও কমলা এই দশ দেবতা সাধারণত মহাবিদ্যা নামে পরিচিত। বিষ্ণুর অবতা নাম ও সংখ্যা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে যেরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যা মহাবিদ্যার নাম ও সংখ্যা লইয়াও তন্ত্রসাহিত্যে সেইরূপ মতভেদের পরিচয় পাও যায়। ফলে, কোনো কোনো মতে প্রচলিত অনেক দেবতাই মহাবিদ্যারূ উল্লিখিত তন্ত্রসার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালিনী-বিজয় হইতে উদ্ধৃ তালিকার মতে মহাদুর্গা, কামাখ্যাবাসিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা প্রভৃতি দেবতা মহাবিদ্যা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত তন্ত্রকৌমুদী নাম গ্রন্থে যে সপ্তবিংশতি মহাবিদ্যার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যেও দুর্গ অন্নপূর্ণা, মহিষমর্দিনী, গৌরী, প্রত্যঙ্গিরা, চামুণ্ডা, কাত্যায়নী প্রভৃতি অল্পবিস্ত পরিচিত ও প্রচলিত দেবতার নাম পাওয়া যায়। বাংলাদেশের এইসব দেবতা মধ্যে কালী, তারা, ষোড়শী, দুর্গা ও অন্নপূর্ণা এই কয় দেবতার উপাসক অধিকাংশ লোক। ইঁহাদের নিত্য উপাসনা ঘরে ঘরে প্রচলিত—ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশেষ পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব বাংলাদেশে সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদে মধ্যে অন্নপূর্ণা ব্যতীত অন্য চারজনের পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে বাঙালী রচিত একাধি স্বতন্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বগলা, ছিন্নমস্তা, প্রত্যঙ্গিরা প্রভৃতি দেবতা পূজা আভিচারিক কার্যে— মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্টজন ব্যাপারে প্রচলিত। আভিচারিক দেবতার পূজায় মূর্তিনির্মাণের প্রচলন দেখা য

। সাধারণত ঘটের উপরেই ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। ইহার কারণ বোধ ।, ইহাদের মূর্তির ভীষণতা। বাংলার বাহিরের শাক্তদের মধ্যে এতদতিরিক্ত ন্যান্য বহু দেবতারও উপাসনার প্রচলন আছে বা ছিল। ইহাদের মধ্যে চণ্ডী, ায়ত্রী প্রভৃতি দেবতার নিত্য উপাসনার একাধিক পদ্ধতি-গ্রন্থ দেখিতে াওয়া যায়।

উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ও সমধিক আদৃত ‍বতা হইতেছেন কালী। বাংলার বাহিরে ও ভারতের বিভিন্ন অংশে ‍ঙালী যেসব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থানেই ালীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ালীমূর্তি নিয়ত পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য শাক্ত দেবতার উপাসনাও নেক স্থলে কালীর মূর্তির উপরই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—স্বতন্ত্র মূর্তি প্রস্তুত রিবার প্রয়োজন হয় না। তাই দুর্গাপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ্রভৃতি বাংলার প্রসিদ্ধ উৎসবের সময় প্রতি কালী-মন্দিরে উৎসবের ঘটা পড়িয়া য়। তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দেবতার উপাসকেরাও এই দেবতার মূর্তির সম্মুখেই নেক ক্ষেত্রে স্বীয় ইষ্টদেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। বর্ষের বিভিন্ন সময়ে ালীর যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসববহুল বিশেষ পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, ারা প্রভৃতির সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐসব উৎসবের দিনে ারা ও ষোড়শীর উপাসকেরাও কালীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া াকেন।

কালীর বিভিন্ন রূপের বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্রসাহিত্যে পাওয়া যায়। গুহ্যকালী, দ্রকালী, শ্মশানকালী, শ্বেতকালী প্রভৃতির উপাসনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ।ভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলাদেশে নানা স্থানে নানা নামে এই ‍বতা পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে স্থানের নামে ইহার নাম। যথা— ঢাকেশ্বরী, :শারেশ্বরী প্রভৃতি। সিদ্ধেশ্বরী, করুণাময়ী, আনন্দময়ী প্রভৃতি নামেও তিনি হুস্থলে পরিচিত। এইসমস্ত নামের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ত শতাব্দীর সংবাদপত্রে উল্লিখিত কলিকাতার বাগবাজার, হুগলীর অন্তর্গত

কালীপুর ও তারকেশ্বরের সমীপবর্তী এক প্রান্তরে অবস্থিত তিনটি সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমার কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালে কথা' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ওআর্ড সাহেব প্রণীত এ ভিউ অব দি হিস্ট্রি লিটরেচর্ অ্যাণ্ড রিলিজন অব দি হিণ্ডুজ (২য় খণ্ড, শ্রীরামপুর, ১৮১৫) গ্রন্থে সিদ্ধেশ্বরী ও করুণাময়ীর বিবরণ পাওয়া যায়। কলিকাতার নিমতলা আনন্দময়ী প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, অন্যান্য যেসমস্ত স্থানের কালী প্রসিদ্ধ তাহাদে মধ্যে সর্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিস্থান মেহার গ্রামের নাম পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে। বরিশালের অন্তর্গত পোনাবালিয়ার কালীবাড়িও চতুষ্পার্শ্বব জনসমাজে যথেষ্ট পরিচিত।

তারাপূজার জন্য যেসমস্ত স্থান প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রাম ও বীরভূমের চণ্ডীপুর গ্রামের সমীপবর্তী তারাপীঠ উল্লেখযোগ্য। দেবীর একপঞ্চাশৎ পীঠস্থানের অন্যতম সুগন্ধা বর্তমান শিকারপুর বলিয়া মনে করা হয়। তারাপীঠ গত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সাধ বামাক্ষেপার সিদ্ধিস্থান।

অন্যতম পীঠস্থানরূপে পরিচিত ত্রিপুরার অন্তর্গত রাধাকিশোরপুর গ্রামে ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির ও চব্বিশ-পরগনার জয়নগর মজিলপুরের নিকটবর্তী মথুরাপুরের অনতিদূরে ছত্রভোগ নামক স্থানের ত্রিপুরসুন্দরীর মন্দির বাংলা দেশে ষোড়শী দেবীর উপাসনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন হিসাবে বিরাজ করিতেছে।

শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অন্যান্য শাক্ত দেবতার মন্দির ও মূর্তির মধ্যে যশোহরের সেখহাটি গ্রামের প্রস্তরময়ী ভুবনেশ্বরী, চাচরের দশমহাবিদ্যা, সীতারাম প্রতিষ্ঠি বলিয়া প্রসিদ্ধ মামুদপুরের দশভুজা ধাতুময়ী দুর্গা, উত্তরবঙ্গের মহাদেবপুর থানা অন্তর্গত সিদ্ধিপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রামপালের সমসাময়িক দিব্য বা দিব্বোকে ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের উপাস্যা চামুণ্ডাদেবী ও চন্দননগরের বোরাইচণ্ডীতলার পিত্তল ময়ী ভীষণকায়া দণ্ডায়মানা চণ্ডীমূর্তির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেবী একপঞ্চাশৎ পীঠস্থানের মধ্যে প্রায় কুড়িটি বাংলার নানাস্থানে অবস্থিত বলি অনুমান করা হয়। এইসকল স্থানে বিভিন্ন নামে শক্তির উপাসনা প্রসিদ্ধ

গণেশজননী মুক্তকেশী সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী কৃষ্ণক্রোড়া কমলে কামিনী প্রভৃতি বহু নামে বিবিধ প্রকারে দেবীর উপাসনার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ওআর্ড সাহেব ইঁহাদের কতকগুলি রূপের বিবরণ দিয়াছেন। তবে তিনি কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো মূর্তি অর্বাচীন হওয়া অসম্ভব নয়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যে দিগ্‌বন্দনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত শাক্ত দেবতাসমূহের মধ্যে রঙ্কিণী যোগাদ্যা বিশালাক্ষী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা পূর্বোল্লিখিত কোনো দেবতাবিশেষের রূপান্তর কি না, তাহা বলা যায় না। তন্ত্রসাহিত্যে ইহাদের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় রঙ্কিণী দেবীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রজেনবাবুর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ধমানে রঙ্কিণী দেবীর পূজা ও তদুপলক্ষে প্রদত্ত নরবলির উল্লেখ আছে। যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' (পৃ ৩৩৭—৯) হইতে জানিতে পারা যায়, মেদিনীপুরের অন্তর্গত ইন্দা গ্রামে রঙ্কিণী দেবীর এক ভগ্নমন্দির এখনও বর্তমান। এই দেবী এতদঞ্চলের ধবলবংশীয় রাজাদের আরাধ্য ছিলেন। ইঁহার মন্দিরে প্রতিদিন একটি করিয়া নরবলি হইত। পীর লোহানী সাহেব এই মন্দির ধ্বংস করিয়া নরবলি-প্রথার উচ্ছেদসাধন করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর থানার অধীন চকদীঘি পরগনায় রঙ্কিণী-মহুলা গ্রামে রঙ্কিণী-দেবীর পাষাণময়ী মূর্তি বর্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অরঙ্গানগর পরগনার মধ্যে মানঝাউগড় গ্রামে রঙ্কিণী দেবীর এক পীঠস্থান আছে। এই দুই স্থানে এখনও প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মেলা হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ঘাটশীলা, পাঁচড়া ও ভেরুয়ার রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ আছে।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার বিস্তৃত বিবরণ কবি কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত 'যোগাদ্যার বন্দনা' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। হনুমান্ অহিরাবণ ও মহীরাবণকে বধ করিলে তাঁহাদের উপাস্যা দেবী ভদ্রকালী তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য

হনুমানকে অনুরোধ করেন। হনুমান্ তাঁহাকে পিঠে করিয়া বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে লইয়া আসেন। ইঁহার পূজায়ও নরবলির প্রয়োজন হইত—কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। ক্ষীরগ্রাম অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত। প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তির দিন এখানে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, কবিশেখরের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে বিক্রমপুরের বিশালাক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘাটালে ও টিটাগড়ে বিশালাক্ষীর মন্দির বর্তমান। ওআর্ড সাহেব বর্ধমানের সেনহাটি গ্রামে বিশালাক্ষীর মৃন্ময়ী মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বিশালাক্ষীকে ইষ্টদেবীরূপে পূজা করে এরূপ সম্প্রদায়ের কথাও তিনি বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের উপাস্যা বাসুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর প্রকৃত স্বরূপ লইয়া পণ্ডিতসমাজে বিস্তর মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

বাংলার বাহিরেও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শক্তি-দেবতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর পীঠস্থান অনেকগুলি বাংলার বাহিরে অবস্থিত। আদ্যাস্তোত্রে বিভিন্ন স্থানের দেবীর বিভিন্ন রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। নানা স্থানে দেবীর নানা মূর্তি, মন্দির ও পূজার ক্ষেত্র বর্তমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গয়ার গয়েশ্বরী ও মঙ্গলাগৌরী, পুরীর বিমলা, বোম্বাইর মহালক্ষ্মী ও মুম্বাদেবী, আমেদাবাদের ভদ্রা, আবুর অম্বাদেবী, পাঞ্জাবের কাঙড়া দেবী, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী, হরিদ্বারের মায়াদেবী ও চণ্ডী, কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী, উজ্জয়িনীর সমীপবর্তী ইটদ্বীপের পাষাণময়ী কালী, মানস সরোবরের ভীষণাকৃতি দশভুজা এবং মহাবলিপুরম্‌এর মহিষমর্দিনী[২৭] উল্লেখযোগ্য।

২৭ দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে কালী বা দুর্গা নামে পরিচিত এই জাতীয় বহু মূর্তি দেখা যায়—অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক ডক্টর অচ্যুত মেনন কেরলে কালীপূজা সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় মলয়ালম্ ভাষায় লিখিত হওয়ায় ইহার বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই।

তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। আপাতদৃষ্টিতে উহার টনাটি বিভ্রান্তিকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। বিস্তৃত বিবরণ প্রদান বা ালোচনার স্থান এখানে নাই। তবে, একটু অনুধাবন করিলেই ইহার গভীর র্শনিক রহস্য বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ দার্শনিক তত্ত্বোপলব্ধির সহায়তা পাদনের জন্যই এই পূজাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল মনে হয়। বৈদিক ান্ত্রিক মিশ্র পৌরাণিক প্রভৃতি বিভিন্ন পূজাপদ্ধতির মধ্যে তান্ত্রিক পদ্ধতিই াদর্শ। পূজকের শুদ্ধিসম্পাদনের জন্য বিহিত ভূতশুদ্ধি ও বিবিধ ন্যাস ইহার ধান অঙ্গ। প্রতি অঙ্গেই দার্শনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। ভূতশুদ্ধি অনুষ্ঠানে দয়স্থিত দীপশিখাকার জীবাত্মাকে মস্তকে সহস্রকমলস্থ পরমাত্মায় সুষুম্নানাড়ী-থে সংযুক্ত করিবার বিধান আছে। পূজাকালে পূজক সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন দেবতাকে ন্তা করিয়া 'সোহং' মন্ত্র জপ করিবেন, অনন্যমনা হইয়া দেবরূপে নিজেকে ল্পনা করিবেন এবং আনন্দামৃতমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিবেন। পূজাশেষে 'বতাকে জ্যোতিঃস্বরূপ চিন্তা করিয়া সেই জ্যোতিকে স্বীয় হৃৎপদ্মস্থিত জ্যোতিঃ-রূপ ভগবানে স্থাপন করিতে হইবে। যাঁহারা উচ্চস্তরের সাধক, যাঁহারা াহ্যপূজা-নিরপেক্ষ ও অন্তর্যাগপরায়ণ তাঁহাদের জন্য নিজদেহেই দেবপূজার াবস্থা করা হইয়াছে।

তান্ত্রিক উপাসনা সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা এখানে বলা দরকার। পাসনার অধিকার অর্জন করিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন দীক্ষা। জাতি-বর্ণ ীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই দীক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। এই অধিকার ানুসারে আজ পর্যন্ত দীক্ষা বা মন্ত্র নেওয়ার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে েখিতে পাওয়া যায়। শুভদিনে গুরু শিষ্যকে বিশেষ দেবতার বিশেষ মন্ত্রে ীক্ষিত করেন। একই দেবতার বহু মন্ত্র আছে। আপাতত অর্থহীন এক বা াকাধিক শব্দ লইয়া এই মন্ত্র গঠিত। কোন্ সাধকের পক্ষে কোন্ মন্ত্র পযোগী হইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা াছে। সাধক কখনও স্বীয় ইষ্টদেবতা ও মন্ত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ রেন না। তাঁহাকে প্রতিদিন এই মন্ত্রসহযোগে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দন

পূজার্চনাদি করিতে হয়। মন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার জন্য কেহ কে পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যোগ্যতা অনুসারে শাক্তাভিযে পূর্ণাভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়। দেহ ও মনকে সাধন উপযুক্ত ও সুসংযত করিবার জন্য তান্ত্রিক যোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্র করিতে হয়।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

* সচিত্র

৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

* সচিত্র

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১৷৹

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২৷৹

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২৷৹

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১৷৹

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ২৷৹

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১৷৹

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১৷৹

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩৷৹

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১৷৹

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২৷৹

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ ২৷৹, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজা-পার্বণ ৩৲, ৪৲৹